

সম্রাস আর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে ত্রিপুরা
আজ বিপর্যস্ত। রাতের অন্ধকারে সাংবাদিক বাসুদেবের
শ্যালক সৌমিত্রকে অপহরণ করে নিয়ে গেল এক জঙ্গিগোষ্ঠী।
তার প্রাণের বিনিময়ে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করল
তারা। তারপর? এক রক্তাশাস উত্তেজনার টানটান
সমরেশ মজুমদারের 'এত রক্ত কেন'।

এত রক্ত কেন • সমরেশ মজুমদার



এত রক্ত
সমরেশ



9 788177 561920



এটি উপন্যাস। কেউ বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজতে চেষ্টা করলে সেটাকে কাকতালীয় ভাবাই সমস্ত।

স. ম.

কৈলাসনগরে ভাল কলেজ থাকলেও তার ব্যাতি আগরতলার মহারাজের স্থাপিত কলেজের মতো নয়। স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ার অজয় জেব খরেছিল সে আগরতলার পড়তে যাবে। কলেজ এবং হোস্টেলের খরচ চালানো ওর বাবার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু তিনি চাইছিলেন ছেলে চোখের সামনে থাকুক। মুশকিল হল ওর মামাকে নিয়ে। তিনি নির্দেশ পাঠালেন, 'ভায়ে যা চাইছে তাই করতে দেওয়া হোক।' সম্বন্ধীর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা শুধু হেমন দেববর্মা কেন, রিপুয়ার বেশির ভাগ উপজাতি মানুষের নেই।

তবে একটি ব্যাপারে হেমন দেববর্মা নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর ছেলে অজয় মামার পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। মামাকে সে শেষবার দেখেছে তার আট বছর বয়সে। তখন থেকেই মামা আভারগ্রাউন্ডে, স্বাধীন রিপুয়া আন্দোলনের পুরোভাগে। দশ-বারো বছর বয়সে পৌছালেই অনেক উপজাতি কিশোর ওই স্বাধীন রিপুয়ার ছুরে আক্রমণ হয়। পড়াশুনা চুসোয় যায়। বাড়ি ছাড়ে। বিছানায় শুয়ে রোগে ভুগে তাদের মৃত্যু হয় না। তারা মরে বি. এস. এফ অথবা আধা সামরিক বাহিনীর গুলিতে। সেটা যদি কপালে না লেখা থাকে তা হলে পাগটা জঙ্গি সংগঠনের এ কে ফটিসেভেন তো উচিরে থাকেই। অজয় এই আবেগে ভাসেনি। মন দিয়ে পড়াশুনা করেছে। হেমন দেববর্মা ছেলের কানে সুপারমার্শ চলে দিয়েছেন সবসময়। হ্যাঁ, কুলে থাকতে ওকে তারও খরচের পড়তে সেননি।

কলেজটি নামকরা। হোস্টেলের ব্যবস্থাও ভাল। দুপুরে অজয়কে তার ঘরে নিয়ে গেল দারোয়ান। তখনও রুমমেট আসেনি। একটু আগে সুপার তাকে হোস্টেলের নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, নিয়ম না ভাঙলে কাউকে তাড়ানো হয় না। আর হ্যাঁ, বড়দের মুখের ওপর প্রতিবাদ না করলে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। শিশুবেলা থেকে শোনা এইসব উপদেশ মান্য করতে তার কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

সারাদিন সে ঘরে একাই ছিল। বই নিয়ে সময় কাটাচ্ছিল। সন্দের পর দরজায় শব্দ হল। সে উঠে দরজা খুলতেই চারজন ছেলে ভেতরে ঢুকল। ওরা তার চেয়ে বয়সে বড়। বোকা যাচ্ছে, এই হোস্টেলেই থাকে। একজন দরজাটা বন্ধ করে দিল। ওরা বসল উলটোদিকে খালি তক্তাপোশে। বাদিকের হোসেটি জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে হোস্টেল?'

'ভাল।' অজয়ের খুব অস্থিতি হচ্ছিল।

'নাম কী?'

'অজয় দেববর্মা।'

'তার মানে তুমি রাজার ছাতা?' দ্বিতীয় ছেলেটি হাসল।

‘আমি জানি না।’

‘এবার জানবি। তোর বাপ কী করে? আন্ডারগ্রাউন্ডে?’

‘না। উনি ব্যর্থসা’ করেন। ছোট ব্যবসা।’

‘মিথ্যে কথা। তোর বাড়িতে কটা রাইফেল আছে বল।’ তৃতীয়জন প্রশ্ন করল।

‘শুধি বলছি, আমরা অস্ত্র রাখি না।’

‘ত্রিপুরাটা কার? তোর বাবার?’

‘না, জা কেন হবে—!’ হকচকিয়ে গেল অজয়।

‘তুই তো উপজাতি, আমরা বাঙালি, বাঙালি খেদাবি না?’

‘আমি ওসবের মধ্যে নেই, আমি রাজনীতি করি না।’

‘খাটের ওপর উঠে দাঁড়া—!’

‘কেন?’

‘দেখব, তোর সব সম্পত্তি মানুষের মতো কি না। প্যাণ্ট খোল, জলদি—!’

একজন উঠে ওর প্যাণ্টে হাত নিতেই সে নিজেকে বাঁচাতে চাইল। শক্তি প্রয়োগ করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা কাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপরে। শরীর নয় করল, শুইয়ে দিল উপড় করে। তারপর সিগারেট জ্বালিয়ে আঁকন চোপে ধরতে লাগল পিঠে, নিতম্বে। মুখ চোপে ধরেছিল একজন বালিশে। একটা সময় শুধু গোড়ানির অ্যওয়াজ নেকড়ে লাগল গলা দিয়ে। তখন ওরা একটু সরে দাঁড়াল, ‘মন দিয়ে শোনা। কেউ বেনে জানতে না পারে। হোস্টেলে প্রথম ঢুকলে এসব হয়। এ বছর আমরা দলে ভারী। বর্কনই আমাদের দেখছি, নমস্কার করবি। আর সুপারকে যদি নালিশ করিস তা হলে ওই জিত তোর মুখে থাকবে না।’ ওরা চলে গিয়েছিল।

সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেল অজয়। কোন-ওরোতে উঠে দরজার কাছে পৌঁছে সে কঁদে উঠল। ছুটে এল দারোয়ান। তারপর এলেন সুপার। ওর নয় শরীরে কাপড়ের আড়াল দেওয়া হল। ভদ্রত্বোক ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী হয়েছে, কে করেছে? সব আমাদের খুলে বোলা। আই উইল ট্রেক আকশন।’ কথা বলার ক্ষমতা ছিল না অজয়ের। তখনই ওকে হাসপাতালে পাঠানো হল। খবর পেয়ে কলেজের অধ্যক্ষ চলে এলেন হোস্টেলে। সমস্ত আবাসিকদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করা হল। সবারই এক উত্তর, অজয়কে তারা কখনও দেখিনি, চেনেও না। এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও সংযোগ নেই। শুধু বাঙালি আবাসিক নয়, উপজাতি আবাসিকরাও একই কথা বলল।

রাত তখন একটা। আগরতলার খেলার মাঠের পাশে হরিগঙ্গা রোডের একটা বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠল। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে, শুধু তিরিশ পেরোনো এক যুবক তাঁর কম্পাউটারের সামনে বসে কাজ করছিলেন। ফোনটা তাঁকেই ধরতে হল, ‘হ্যালো।’

‘ঘটনাটা শুনছ?’ পরিচিত গলা। বেশ পরিচিত।

‘কোন ঘটনাটা?’

‘তা তো জিগাইবাই। শালা টিক টাইমে তুমরা কানে পড়ি বাইন্ডা থাক। মহারাজার

কলেজ হোস্টেলে আমার ডার্মিনাকে যারা মাইবরা ফেলতেছিল তারা কে?’

‘আপনার ভায়ে? ওখানে থাকে?’

‘হ। আজই প্রথম ভর্তি হইছিল। রিপোর্টার, আমার ডার্মিনার যদি কিছু হয় তা হলে আমি হোস্টেল উড়িয়া দেব।’

‘ঠিক কী হয়েছে বলবেন?’

‘ভূমি খবর নাও। ডার্মিনাটাকে বাঁচাও।’ লাইনটা কেটে দেওয়া হল।

রিপোর্টার সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেলে টেলিফোন করলেন। রিং হচ্ছে। বেশ কিছুটা সময়ের পর হোস্টেলের দারোয়ান রিসিভার তুলল, ‘কে?’

‘আমি রিপোর্টার যোষ বলছি। সুপার আছেন?’

‘না নেই।’

‘আজ হোস্টেলে কী হয়েছে?’

‘আমি জানি না কিছু। সুপার এখন হাসপাতালে—।’

‘হাসপাতালে কেন?’

‘একজন নতুন ছেলের শরীর ব্যাথা হয়েছে, তাকে নিয়ে গিয়েছেন।’

‘কী নাম ছেলটির।’

‘অজয় দেববর্ম।’

‘মাই গড!’ রিসিভার রেখে চটপট তৈরি হয়ে নিলেন রিপোর্টার। তারপর ভিগ বের করে ছুটলেন হাসপাতালে। অত রাত্রে সুপারকে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। কী কী হয়েছিল তার অমানুষিক বিবরণ শুনল সে।

‘কিন্তু এই রীতবৎস অত্যাচার কেন করল?’

‘এটাই বুঝতে পারছি না। রায়গি প্রতি বছর হয়, এরকম বাড়াবাড়ি কখনও হয়নি।’

‘অজয়ের সঙ্গে কথা বলা যাবে?’

‘ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন।’ সুপার জানালেন, ‘এখন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে? রিপোর্টার, আমি চাইছি না এটা নিয়ে কাগজে লেখালেখি হোক।’ ‘কেন চাইছেন না? এই যে প্রতি বছর নিরীহ ছেলেগুলোর ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার করা হয় তা বন্ধ হোক আপনি চাইছেন না?’

‘নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু ভেবে দেখুন, এই ঘটনা প্রচারিত হলে কলেজের কতখানি দুর্নাম হবে! কে অপরাধী তা আমরা এখনও ধরতে পারিনি।’ সুপার বললেন।

‘কিন্তু এই ছেলের বাবা যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যাকে আমি পড়তে পাঠিয়েছি তার এই অবস্থা হল কেন, তা হলে কী ভাবাব দেখেন?’

সুপার চুপ করে রইলেন। রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পুলিশ আসেনি?’

‘না। এখনও বোধহয় ওদের খবর দেওয়া হয়নি। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?’

‘আমি ফোন পেয়েছি। আপনার হোস্টেলের বাঙালি ছেলেরা কাজটা করেছে?’

‘আমি জানি না। ওরা সবাই অস্বীকার করেছে। এমনকী উপজাতি ছেলেরাও ওদের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করেনি।’

রিপোর্টার বললেন, ‘আমি আপনার হোস্টেলের ছেলেরদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

অজয় তো এখন ঘুমোবে। আগনি চলুন, আমাদের সাহায্য করবেন।'

'এত রাতে? ওরা তো এখন ঘুমোচ্ছে।'

'ঘুম থেকে তোলা এমন কিছু পরিস্থিতির কাজ নয়। তা ছাড়া একজন আবাসিক এভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে থাকলে ওদের কারও কারও ঘুম না আসাই স্বাভাবিক।'

সুপারকে গাড়িতে তুলে রিপোর্টার চলে এলেন হোস্টেলে। দারোগানকে বলা হল প্রতিটি আবাসিককে এখনই ঘুম থেকে তুলে হলঘরে নিয়ে আসতে। এরকম কামেলার ব্যাপারে সুপারের আশপিত ছিল। কিন্তু রিপোর্টার তাকে বললেন, 'এটা আপনার হোস্টেলের ব্যর্থই করা দরকার। অজয়ের ওপর নিশ্চয় বাইরের কেউ অত্যাচার করেনি। ওর ওপর অত্যাচার করা হয়েছে এই খবরটা ইতিমধ্যে ঘাসের কাছে পৌঁছে গিয়েছে তাদের নিরীহ ভাবার কোনও কারণ নেই। দেখুন, প্রেস জানল না, পুলিশও না অথচ তারা জেনে আমাদের টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে। ওই হেলগুলার নিরাপত্তার জন্যেই আমি আপনাকে বিব্রত করছি।'

সুপার বড় বড় চোখে তাকালেন। ব্যাপারটা এত দূরে পৌঁছে গিয়েছে তিনি জানতে পারেননি।

ঘুমঘুমে চোখে ছেলেরা এসে দাঁড়াল। নিরীহ চেহারার ছেলেগুলোর বেশির ভাগের ঊর্ধ্বাঙ্গে কাপড় নেই, শুয়েছিল পাজামা পরে। সেই অবস্থায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। সুপার খুব গভীর গলায় রিপোর্টারের পরিচয় দিলেন। রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'অজয় এখন হাসপাতালে। তোমরা কি যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে দুঃখিত?'

একজন-দুজন শেষপর্যন্ত সবাই মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল।

'অজয় বাঙালি নয় এবং তোমরা জানো উপজাতিরা এখন কীরকম ভাবাবেগে আক্রান্ত, তোমরা কি জানতে না এমন কাণ্ড করলে ওই আবেগ আঙুন জ্বালিয়ে দিতে পারে এবং সেই আঙুন থেকে তোমরাও রক্ষা পাবে না।' রিপোর্টার গলা তুললেন।

একটু গুঞ্জন উঠল। একজন বলল, 'স্যার, আমাদেরও আবেগ আছে।'

'দিকই। আবেগ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব ভাবতে যাবার পাতো। কিন্তু তার প্রকাশ কি এই? একটি নিরীহ ছেলের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করলে কি তোমাদের আবেগ সম্মানিত হবে?'

এবার সবাই চুপ করে রইল। রিপোর্টার বললেন, 'আমি জানতে চাই না কে বা কারা এই কাজ করেছে। কিন্তু আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাই, ভবিষ্যতে এধরনের কাজ আর হবে না।'

কেউ কোনও কথা বলছিল না। হঠাৎ একজন প্রশ্ন করল, 'আপনি কে?'

'আমি কে সে কথা তোমাদের সুপার তো জানিয়েছেন।'

'কিন্তু আপনি তো অজয়ের কেউ নন। আপনি বাঙালি!'

রিপোর্টার সুপারের দিকে তাকালেন। হাসলেন। তারপর বললেন, 'আমি একজন মানুষ। যে কোনও সত্য শিক্ষিত মানুষের মতোই আমি চাই না এই ধরনের কাজ হোক।'

১০

'কিন্তু ওরা তো তা করে না। ওরা একজন বাঙালিকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায়। টাকা না পেলে মেরে ফেলে। তার কঙ্কালের জন্যেও পাঁচ লক্ষ টাকা চায়। সেটা কি কোনও মানুষের কাজ?' ছোটটি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'তা হলে তোমরা কি এসব কাজের বদলা নিতে চাও?'

একবারে সামনে দাঁড়ানো সদ্য গৌর গুটা এক তরুণ বলল, 'না। আমি চাই সরকার এগিয়ে এসে ব্যবস্থা নিক। ওদের বোঝাক। তা না হলে অন্যায় সহ্য করা খুব মুশকিল হবে।'

'নিশ্চয়ই এর একটা বিধিই হবে। কিন্তু অজয়ের মতো সাধারণ নিরীহ ছেলেকে যন্ত্রণা দিয়ে তো এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তা ছাড়া এই ঘটনা ঘটলে তোমরা ওদের লক্ষ্যবস্ত হয়ে গেছ। আমি চাই না তোমাদের ক্ষতি হোক। ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিলে আমি ওদের বোঝাতে পারি।' রিপোর্টার বললেন।

মাঝখানে দাঁড়ানো এক তরুণ বলল, 'আমাদের সবাই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে এই হোস্টেলে কোনওরকম র‍্যাংগিং হবে না। কার্ডকে কেউ পেতে দেব না।'

'খ্যাত ইউ।'

সুপার ইশারা করতে ওরা ফিরে গেল নিজের নিজের ঘরো। রিপোর্টার বললেন, 'সহযোগিতার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। হাসপাতালে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে ওরা দু-একদিনের মধ্যেই অজয়কে ছেড়ে দেবে। যতটা না ও শরীরে আহত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি মনে খারাপ করেছে। শুকে এখানে নিয়ে এসে ছেলেদের সঙ্গে যতটা সম্ভব সহজ মনোমেণ্ডার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

সুপার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ওদের জানাবেন কী করে?'

'কাদের? ও। হ্যাঁ, ওরাই যোগাযোগ করবে। ওদের সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারে না যদি না ওরা নিজেরা কথা বলতে চায়। আপনি তো জানেন পুলিশ ওদের খোঁজ পাচ্ছে না।'

'তা হলে? আমার হোস্টেলের ছেলেদের নিরাপত্তার জন্যে কি পুলিশকে ব্যাপারটা জানান।'

'জানতে আপনি অবশ্যই পারেন। কিন্তু পুলিশ কতদিন এই হোস্টেলকে পাহারা দেবে? তা ছাড়া ওরা যখন কলগেজে যাবে তখন? দেখুন, আপনি যা ভাল মনে করেন।' রিপোর্টার হোস্টেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আগামী তরুণ কালাদিবস। পনেরোই মল্লিকের উনিশশো উনপঞ্চাশে। ত্রিপুরার রানি ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরার অস্তিত্ব নিয়ে যোগ দিচ্ছে। এখনও ত্রিপুরার উপজাতির মানুষেরা বিশ্বাস করেন যে রাজা যদি তখন নাবালক না হতেন তা হলে ভারত সরকারের কাছে ত্রিপুরা সমর্পিত হত না। ব্রিটিশরা যখন সমস্ত পৃথিবী জয় করতে তৎপর তখন তারা নেপাল ভূতানে যেমন ঢোকেনি তেমনি

১১

ত্রিপুরার রাজাকেও অসম্মান করেনি। পার্বত্য ত্রিপুরার ওপর রাজার কর্তৃত্ব তারা মেনে নিয়েছিল। হ্যাঁ, হয়তো সমতলে রাজার ভূমিকাকে ওরা প্রায় ভুলিয়ে রেখেছিল। ভারতবর্ষের মানচিত্রে ত্রিপুরা চিহ্নিত হলেও রাজাই ছিলেন শেষ কথা। ত্রিপুরার মানুষ তাঁকে শুধু প্রজাই বলে না, ভালও বাসে। রাজার অপমান তারা সহ্য করতে পারে না। পনেরোই অক্টোবরকে তাই তারা কালাদিবস হিসেবে চিহ্নিত করল। প্রতি বছর ওই দিনটিকে তারা ক্ষোভ প্রকাশের দিন হিসেবে বেছে নিল। বর্তমান রাজা কিরীট বিক্রমশাহিক বাহাদুরের বাবা বীর বিক্রমশাহিক বাহাদুর ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা। তাঁর মৃত্যুর পর নাবালক রাজার পক্ষে দারিদ্র্যভার নিয়েছিলেন মহারানি কাকুনপ্রতা দেবী। রাজপরিবারের ইতিহাসে তাঁর মতো বিদূষী সুন্দরী এবং বিচক্ষণ রানি আর কেউ ছিলেন না। এসব এখন ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাসের মধ্যেই উপজাতিদের বিক্ষোভের কারণগুলো ছড়িয়ে আছে।

বাড়িতে ফিরে এসে কম্পুটারে লেখা শেষ করলেন রিপোর্টার। এই রিপোর্ট পৌঁছে গেল সাতসমুদ্র ওপারে পৃথিবীবিখ্যাত টেলিভিশন সংস্থার নিউজকেন্দ্রে। রিপোর্টের শেষে অজয়ের স্বরটা দিলেন তিনি। কলেজ হোস্টেলে নবাগত ছেলেকে যোগ করা হয়েছে এটা নতুন স্বর নয়। কিন্তু যারা করেছিল তারা সেই রাতেই কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা চেয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনাকে প্রস্রাব দেবে না। এটাই স্বর।

ঘুমোতে যাওয়ার আগে সাগরপারের টেলিভিশন সংস্থাটির নিউজ বুলেটিন শুনল রিপোর্টার। এশিয়ার খবরে তাঁর পাঠানো সংবাদকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এখন ভোর। অস্তিত্ব ঘন্টা চারকে চোখ বোজার জন্যে চেষ্টা করতেই টেলিফোন বাজল। রিপোর্টার রিসিভার তুললেন, 'হ্যালো।'

'হেই রিপোর্টার। তোমার খবর ফনলাম। তা হলে আর কোনও ক্যামেলা নাই?'

'না। নেই।'

'যারা করেছে তাদের নামগুলো বলো।'

'ক্যামেলা যখন নেই তখন আর তাদের নামের কী দরকার?'

'ঠিক আছে, তুমার কথা রাখলাম।'

'আপনি এখন কোথায়?'

'তুমার সম্পর্কে যা জানি তাতে জো এত বোকা মনে হয় নাই।'

'বুঝলাম। কালাদিবসে আপনাদের কর্মসূচী কী?'

'কিন্তু না। ওসব কইর্যা কোনও লাভ হয় না। বোকা বাসির মতো প্ল্যাকার্ড হাতে

নিয়া রাজ্যের হাটলে দিনটা সাদা দিবস হবে?'

লাইনটা কেটে দেওয়া হল।

এক দিকে চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্ট, অন্য দিকে মিজোরাম এবং অসম। ভারত এবং বাংলাদেশ ছাড়া খুব কাছেই বিদেশি রাষ্ট্র আরাকান। কিন্তু তাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই। রাজধানী শহর আগরতলার বাংলাদেশের নিখাস

সবসময় লাসে। বাংলাদেশের আখাউরা থেকে যে রাষ্ট্রাতি একেবারে শহরের মুখে চলে এসেছে তারও নাম আখাউরা সোড। উপশাসন আলোর পনেরোই অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্গত হয়ে গেল। ত্রিপুরার মাটি ভারতের মাটি। এই সরল সত্যটি মেনে নিতে অসুবিধে ছিল অমেকের। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে ত্রিপুরার সরাসরি যেতে যথেষ্ট বেগ পোয়াতে হয়। অসম থেকে ঘুরে ঘুরে ত্রিপুরার পৌঁছানোর যোগ্য অনেক। এই সেদিন, উনিশশো তেরো সালে, যখন গোটা পৃথিবী মহামুন্ডের তাওবে কাঁপছে তখনও ত্রিপুরা অপেক্ষাকৃত শান্ত। মহারাজার বাঙালিপ্রীতি ছিল। নানান সরকারি পদে তিনি দক্ষিণ বাঙালিদের নিয়ে আসছেন। সম্মানিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা দায়িত্ব সম্পাদন করছেন। চাষাবাস এবং শ্রমনির্ভর রাজ্যের জন্যে পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ নিয়ে এসেছেন মহারাজা, যারা পরিশ্রম করতে পারেন। এই বহিরাগতদের লেগে সশ্রমে গোছে যেকোনো ত্রিপুরার আদি বাসিন্দারা। মহারাজা যা করছেন তা ভালর জন্যেই করছেন, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। বস্ত্রত সমস্ত রাজ্যশাসন সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয়েছিল মহারাজের এই সিদ্ধান্তে। যে পার্বত্য ত্রিপুরার তিনি একেবারে সেখান থেকে তাঁর তেমন আর হত না। ইরেজদের কর দিয়েও সমতল থেকেই তিনি বসেই সম্পদ সংগ্রহ করতেন।

ক্রমশঃ বাঙালির সংখ্যা বাড়তে লাগল। দেশ বিভাগের আগে থেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষের আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর পাকিস্তান আমলে চট্টগ্রাম বা শ্রীহট্টের সীমানা পেরিয়ে বাঙালিদের অনেকেই চলে এলেন এপারে। ত্রিপুরার ক্রমশঃ একটি মিশ্রিত বাঙালি জাতি গড়ে উঠল বঙ্গের সঙ্গে শক্তিত বা সংস্কৃতিমন্ড উপজাতি মানুষের কোনও বিরোধ ঘটল না। যেমন, শচীন দেববর্মন। ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু বাঙালি তাঁকে বাঙালি ছাড়া অন্য কিছু ভাবেতে পারেনি। বাংলার গান গেয়েছেন, জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছেন বোম্বোতে গিয়ে। কিন্তু এই মিশ্রণ পছন্দ ছিল না অনেকেরই। যেহেতু বাঙালিদের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনীতির বল ছিল তাই ট্রাইলনল ন্যাশনাল ফ্রন্টের জন্ম হল উনিশশো আটাত্তর সালে। প্রথম প্রতিবাদী কঠ শোনা যেতে লাগল সেইসময় থেকে। সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে গেল। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ করে নুপেন চক্রবর্তী বুঝেছিলেন অস্ত্র দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। যার পরিণতিতে পৃথক স্বঘোষিত জেলা পরিষদের জন্ম হল ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ সিটিউল অনুযায়ী। কিন্তু তাতেও শান্তি এল না। বাহান্তর শতাংশ বাঙালি ত্রিপুরার জনসংখ্যা দখল করে রেখেছে এটা মেনে নিতে পারছিলেন না উপজাতি নেতারা। সমস্ত সংগ্রামে পরাজয় অনিবার্য তবু ছোটখাটো সংঘর্ষ চলছিল। কিন্তু আরও টাকা দরকার। অস্ত্র কেনার টাকা, প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যে যা হাতে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। রোজপারের সহজ পথটাই বেছে নিলেন তারা।

ঘুম ভাঙল বেলা বায়োটায়। ঘরে ঢুকল নীলা, হাতে চায়ের কাপ। হেসে বলল, 'এরকম অনিয়ম করলে শরীর থাকবে?'

'আর শরীর।' হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল রিপোর্টার বাসুদেব ঘোষ, 'যা অবস্থা

আমরা খুব কড়াফড়ি করছি। কোনওরকম শান্তিভঙ্গ করার চেষ্টা সেখানেই আকন্ডন দেওয়া হবে।' বাসুদেবের নিকে চাকিয়ে বেশ তারিয়ে তারিয়ে বললেন নি থি।

'আমরা মানে? আপনি তো এখন রিটার্ডে। কী দরকার এসব নিয়ে ভাবার? যাক সে, ডাক্তারসাহেব কোথায়? যাকিঁতে আছে?' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। ওর ঘরেই আছে।'

সৌমিত্র বিবাহিত। এখনও সন্তান হয়নি। দুই ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বছর চারেক আগে। অথচ ন্যূনতম দুই বছর না বলে ডি আই জি সাহেবের স্ত্রীর বেশ সৌন্দর্য আছে। ওরা সৌমিত্রর ঘরে ঢুকে শুনে সিঁটিতে রবীন্দ্রনাথের গান বাজছে। সৌমিত্রর স্ত্রী অলমারি খুলে শাড়ি গোছাতে ব্যস্ত, সৌমিত্র ইচ্ছামের শুয়ে বই পড়ছে।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'কী বখর ডাক্তারবাবু?'

'আরে। এসো এসো। বসো।'

'আজ স্বপ্নমশাইয়ের অবসরের দিন। সেলিব্রেট করতে আসতে হল।'

'হ্যাঁ। বাবা বৈঠে গেল। আমিও যদি অবসর নিতে পারতাম!'

'নিশ্চয় নাও। ডি আর তো নিতেই পার, পার না?'

'নাঃ। তবিন চাকরি হয়নি।'

'ডাক্তারি করা সত্যি তোমার ভাল লাগছে না?'

'নট দ্যাট। কোনও ব্যাধি ডিউটি করতে হচ্ছে হয় না। পিছুসেব বলেছেন প্র্যাকটিশ করতে। স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। কোথায় স্বাধীনতা? তখন তো চকিশ ঘণ্টাই আমার থাকবে না।'

'তা হলে ডাক্তারিটা পড়লে কেন?'

'ভেবেছিলাম ত্রিপুরা গরিব রাজ্য। ডাক্তার হয়ে মানুষের কাজে লাগব। কিছু যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে শুধু বই পড়ে যদি জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত। বিবাসন করে, হাসপাতালে গিয়ে কলিন ডিউটি করা ছাড়া আমার কিছু করার নেই।' সৌমিত্র মাথা নাড়ল।

সৌমিত্রর স্ত্রী এতক্ষণ চুপচাপ শুনিছিল। এবার কথা বলল, 'বাবা-রিটার্ডার করেছেন। চাকরি ছাড়লে কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছ?'

'নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'কী বই পড়ছ বাবা?'

'বাঙালির ইতিহাস।' সৌমিত্র বলল।

এইসময় শাশুড়ি ঘরে এলেন। তাঁর হাতে একটা থাম। বাসুদেব আর নীল্যকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন, 'ওমা, তোমরা কখন এসেছ?'

'নীলা বলল, 'এই তো, এইমাত্র।'

'আমার বুক থেকে এতদিনে পাখরটা নামল।'

বাসুদেব বলল, 'ডি আই জি সাহেবের চাকরিটা চলে যাক আপনি চাইছিলেন?'

'চলে যাওয়া চাইনি, ভালয় ভালয় শেষ হোক বলে রোজ প্রার্থনা করতাম। সেই বিয়ের পর থেকেই আমি স্বামী পুণিল। যখন সাধারণ অফিসার ছিলেন তখন থেকেই জানতাম চোর বদমাস ডাকাতরা যে কোনও সময় প্রতিশোধ নিতে পারে। তারপর

১৬

ওইসব উগ্রপ্রহীরা যখন মানুষ মারতে লাগল তখন তো—। সে সময় অবশ্য বলেছি, চাকরি ছেড়ে লাও, উনি শোনেলেননি। একটার পর একটা প্রমাণন নিয়ে গেছেন। ঠাকুর পাশে ছিলেন বলে আভকের দিনটা এল। তোমরা গরু করো, আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করছি।' শাশুড়ি বললেন।

সৌমিত্রর ঝুট বলল, 'মা, আপনি থাকুন, আমি যাচ্ছি।'

ভদ্রমহিলার তখন খেয়াল হল, 'এই দেখো, ভুলেই গিয়েছিলাম। দুপুরে তোর এই চিঠি এসেছিল। বউমা খুশোছিল বলে পরে দেব ভেবেছিলাম। আর খেয়াল নেই। না।'

সৌমিত্র মায়ের হাত থেকে বাঁচা নিয়ে চোখ বুলিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে বড় কর্তার প্রেমপত্র। যেটা কানাদুখো জনহিলাম সেটা বোধহয় সত্যি হল।' সে খামের খুঁটা সতর্কপে ছিড়ল। সবাই সেখান চিঠিটা পড়তে পড়তে সৌমিত্রর মুখ প্রথমে শক্ত হলেও শেষপর্যন্ত হাসি ফুটল। সে বলল, 'ভালই হল।'

ওর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'কী চিঠি?'

'সরকার আমাকে জলসাধারনের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। একেবারে গ্রামে বদলি করা হয়েছে।' সৌমিত্র চিঠিটা খামে ঢুকিয়ে রাখল।

শাশুড়ি চিৎকার করে উঠলেন, 'সে কী?'

সৌমিত্রর স্ত্রী ফ্যানফেসে গলায় জ্বালতে চাইল, 'কেন গ্রামে?'

'বুরাখা।'

বাসুদেব বলল, 'মনে হচ্ছে হেলথ ডিপার্টমেন্টের কেউ তোমার সঙ্গে খুলতা করেছে।'

'দূর। কারও সঙ্গে আমার কণ্ডাকাটিও হয়নি।' সৌমিত্র হাসল।

'তোমার সঙ্গে হয়নি কিন্তু তুমি ডি আই জি সাহেবের ছেলে, এটাও তো কারণ হতে পারে।'

'বুরাখা যেতে কতক্ষণ লাগে?' সৌমিত্রর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

'কতক্ষণ আর। তবে ভেইলি প্যাসেঞ্জারি করা যাবে না।'

'জায়গাটা কেমন?' নীলা জানতে চাইল।

'আমি বুরাখাতে কখনও যাইনি তবে আগেপাশে গিয়েছি। খুব ভাল। চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো প্রকৃতি চারপাশে। একটাই সমস্যা হবে, তুমি বাংলায় কথা বলার মানুষ পাবে না।' বাসুদেবের কথাটা শোনার শাশুড়ি জায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'কী আর করা যাবে।' সৌমিত্র বলল, 'সরকারি চাকরিতে বদলি হতেই হয়।'

ওর স্ত্রী বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে ত্রিপুরার অন্য শহরে বদলি না করে গ্রামে বদলি করল কেন? আমার খুব ভয় করছে।'

পি বি বসুকে দেখা গেল স্ত্রীকে পিছনে ফেলে ভড়িঘড়ি ছেলের ঘরে ঢুকতে, 'কী ব্যাপার? তোমার মা বলল ট্রান্সফার অর্ডার এসেছে।'

'হ্যাঁ। সৌমিত্র স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কেনম হয় আর কি?'

'বুরাখাতে ট্রান্সফার করেছে?'

‘হ্যাঁ, তাই তো লিখেছে।’

‘ইম্পসিবল! তুমি ওখানে যাচ্ছ না।’

‘কেন?’

‘ওই এলাকার কোনও বাড়ি পি পা রাখতে সাহস পায় না এ কথা খবরের কাগজে পড়নি? এই যে বাসুদেব, তুমি নিশ্চয়ই বলবে না ব্যাপারটা জ্ঞান না! পি বি উত্তেজিত।

‘ওই কথাই বলছিলাম। বাংলায় কথা বলতে পারবে না।’ বাসুদেব বলল।

‘শুধু কথা বলতে? কিছুই পারবে না। ওটা উপজাতি এলাকা। গিয়ে শুনে সবাই সি পি এমের সমর্থক কিন্তু ওদের আশি জাগই উগ্রপন্থীদের সমর্থন করে। এখন ওদের ধারণা হয়েছে বাঙালিরাই প্রধান শত্রু। তুমি সেই শত্রুপন্থীতে কদিন থাকতে পারবে?’

বাসুদেব বলল, ‘আমার একটা বিনীত জিজ্ঞাসা আছে।’

পি বি চোখ ঘোরালেন, ‘চালাকি করো না।’

শান্তি ধমকে উঠলেন, ‘জামাইয়ের সঙ্গে এ কী ধরনের কথা। তুমি কিছু মনে করো না বাবা।’ ভদ্রমহিলা সত্যি লজ্জিত হলেন।

‘চালাকি নয়। আজ অবধি আপনি ত্রিপুরা পুলিশের সর্বময় কর্তাদের একজন ছিলেন। একই রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও বাঙালি থাকতে পারবে না জেনে কোনও ব্যবস্থা নেননি কেন? কেন ওদের বাড়তে দিয়েছিলেন?’

‘নেওয়া হয়নি তোমাকে কে বলল? তুমি তো তোমার রিপোর্টে শুধু আমাদের সমালোচনা করে যাচ্ছ। ওরা বর্তমান অ্যাকশনে না নামছে ততক্ষণ আমরা কিছুই করতে পারি না। অ্যাকশনে নামলেই ব্যাপক ধরপাকড় করা হয়। ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে সেই নৃপেন চক্রবর্তীর আমল থেকেই। এ কথা তুমি জ্ঞান না?’ পি বি চেয়ারে বসলেন।

শান্তি মাথা নড়লেন, ‘না খোকা, তুমি চাকরি ছেড়ে দে। যেতে হবে না তোকে।’ সৌমিত্র হাসল, ‘চাকরি ছেড়ে দিলে বাচব কী করে?’

পি বি তাকালেন, ‘আমার সামনে কথটা বলতে তোমার লজ্জা করল না? তা হ্যাঁ চাকরি না করলে যদি রোজগার বন্ধ হয় তা হলে ডাকারি পড়েছিলে কেন? প্রায়শ্চিত্ত করো। আমি তোমার চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।’

সৌমিত্র বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবছ। আমি একজন ডাক্তার। ওখানকার মানুষ গরিব। চিকিৎসা হাসপাতাল লেখনি, হেলথ সেন্টার লিখেছে। তার মানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে এলাকাটা। ততএব আমাকে ওদের প্রয়োজন হবে। একজন ডাক্তারের কতি করা মানে নিজেদের সর্বাঙ্গ করা এটা নিশ্চয়ই ওরা বোঝে। তা হ্যাঁ আমি তো চেয়েছিলাম মানুষের জন্যে কাজ করতে। এখানকার হাসপাতালের সিনিয়ররা যে পথে চলতে বলেন আমাকে সেই পথে চলতে হয়। ওখানে আমি স্বাধীনতা পাব। কী বল বাসুদেব?’

বাসুদেব মাথা নড়ল, ‘আমি একমত। ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে হলে গোমে

যাওয়া উচিত। এখানে তোমার যে অলসতা ও ওখানে গেলে নিশ্চয়ই কেটে যাবে। আর সত্যি তো, গোমের মানুষ যদি তোমার কাছ থেকে উপকার পায় তা হলে কখনওই ক্ষতি করার কথা ভাববে না।’

পি বি বসু জামাইয়ের দিকে তাকালেন, ‘তুমি কি জ্ঞান আমিও ওখানে মার তিনবার গিয়েছি এবং পাঁচ গাড়ি পুলিশ নিয়ে।’

‘হতেই পারে। কারণ আপনি তখন পুলিশ ছিলেন। ডাক্তার নম।’ বাসুদেব হাসল। নীলা বলল, ‘বাবা, তুমি এক কাজ করো। দাদা যদি সত্যি ওখানে যায় তা হলে ওর সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দাও। এখনকার আই ডি তো তোমার খুব কাছে মানুষ।’

‘না না, আমার কোনও সিকিউরিটি লাগবে না। ওসব থাকলেই ওরা আমাকে মদেই করবে।’ সৌমিত্র খীত প্রতিবাদ জানাল।

হঠাৎ পি বি বসু বাসুদেবের দিকে তাকালেন, ‘তুমি কী বল?’

বাসুদেব কাঁধ কাঁকাল, ‘আপনার নাম পি বি। আপনি আমার চেয়ে ভাল বুঝবেন।’ পি বি বসু তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে গলিগট করে বেরিয়ে গেলেন।

নীলা বলল, ‘তুমি বাবার গেছেন খুব লাগ। বয়স মনো কর না।’

শান্তি ডি বললেন, ‘খারাপ কী বলেছে। কিন্তু বোকা তোর কোনও বিপদ হবে না তো?’

‘তুমি একদম চিন্তা করো না। তবে বাকবে বলবে পুলিশ না পাঠাতে?’ সৌমিত্র বলল।

বাসুদেব বলল, ‘ওতুড়ে যদি। ওখানে কোনও থানা নেই। কোনও পুলিশ তোমাকে চকিশ ঘটা পাহারা দিতে যাবে না। যাক সে, তুমি এখন একাই যেয়ো। যদি বোঝ সব ঠিক আছে তা হলে ম্যাডামকে নিয়ে যেতে পারো।’

সৌমিত্রের বউ বলল, ‘বয়ে গেছে। ওই অজ পাড়াগায়ী গিয়ে আমি কিছুতেই থাকব না।’ ওর বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে ফেলল। এমনকী শান্তিও।

সৌমিত্র শেষপর্ধ্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে ঐতল থেকে কর্মস্থানে চলে গেল। যাকে এককাল অলস বলে মনে হত সে যে হঠাৎ এরকম সক্রিয় হতে পারে তা কেউ ভাবতে পারেনি। বাসুদেব শ্যালকের এরকম সাহসিকতায় মুগ্ধ হল। কালাদিবসের আগের রাতে টেলিফোন বাজল। বাসুদেব হ্যালো বলতেই শুভে পেলে, ‘রিপোর্টার বলতেই?’

‘হ্যাঁ, কে?’

‘তপন রিয়াম।’

বাসুদেব তৎক্ষণাৎ টেপ রেকর্ডার চালু করল। তপন রিয়াম টাইগার জুপের ওপরতলার নেতা। সে হেসে বলল, ‘কী খবর? হঠাৎ আমাকে কোন?’

‘খবর আছে। আরে এই খবর ফরেনে পাঠাইয়া তুমি পরমা কামাইবা।’

‘তা সত্যি। খবরটা কী?’

‘কাল কালাদিবস। শক্তি কানে বলে আমরা এবার দেখাই নিমু। পুরা ত্রিপুরায়

আগুন ছাড়া? বুঝলো? তারা খুব পুলিশ নামাইছে আগরতলায়। আরে আগরতলা মানে তো পুরা ত্রিপুরা না। তোমার রেজিমেন্টে টিভিতে খবরটা বাজলো।' টেলিফোন ছেড়ে দিল তপন রিয়্যাং। ক্যাসেটটা রি-ইউভ করে আবার স্কল বাসুদেব।

ত্রিপুরার ভূমি সংগঠনগুলো মাঝেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। কোনও খবর থাকলে মাতব্বরের মতো শোনায়ে। তাদের উদ্দেশ্য বাসুদেবের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবী খবরটা জানুক। কথা বলতে বলতে এদের অনেককেই জেনেছে সে। শুধু টাইগারের দল নয়, ন্যাশনাল লিবারেশনের কয়েকজনের গলা চিনে ফেলেছে সে। কিন্তু কিছুতেই ওদের টেলিফোন নাথার জোগাড় করতে পারেনি। সাধারণত মোবাইলে কথা বলে ওরা। নাথার চাইলে বলে, 'রিপোর্টার তুমি তো বাঙ্গালি। আমাদের গর্ভত ভাবতেছ নাকি?'

কালান্দিবস উপলক্ষে এই হুমকির রিপোর্ট পাঠাতে গিয়েও মন পরিবর্তন করল সে। এরকম একটা গরম খবর পাঠানোর পর যদি পর্বতের মুখিক প্রসব হয়? কেউ টেলিফোনে তাকে কিছু বলল আর সে বিশ্বাস করে বসল। বাসুদেব পুলিশের এক বড় কর্তাকে ফোন করল। ডব্রলোক বললেন, 'আরে মশাই, শুধু আগরতলা কেন, ত্রিপুরার যে কোনও বড় শহরে ঢুকলে ওদের ছাড়ু করে দেব আমরা। পার্বত্য ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে যা ইচ্ছে করুক। করলে নিজেদের গায়ে নিজেরাই আগুন দেবে। বুঝতেই পারছেন?'

খবরটা হেড কোয়ার্টার্সে পাঠাল না সে। কালান্দিবসের সঙ্কেবোয়া নিশ্চিত হল বাসুদেব। খবরটা প্রচারের জন্যে না পাঠিয়ে সে ঠিক করেছে। একটাও মিছিল বের হয়নি ত্রিপুরার কোনও শহরে। পুলিশকে হত্যা করে কোনও জঙ্গি নেতা আত্মকথা কবির। শুধু গ্রামেগঞ্জে কিছু কিছু বাড়িতে কান্ডো পতাকা জেঁলা হয়েছে। গ্রামের স্কুলগুলোতে জোর করেই কান্ডো পতাকা উড়িয়েছে ওরা। এইকুই! ওই তপন রিয়্যাং নিচাইই জানত এই ঘটনাই ঘটবে তবু তাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। আতঙ্ক সৃষ্টি করে ওরা মজা পায়।

পরের দিন চিট্টি পেল বাসুদেব। সৌমিত্র লিখেছে বুঝাখা থেকে। 'আগরতলায় বলে মামদাই-বুঝাখার নাম স্কলেই বাঙালিরা আতঙ্কিত হয়। সেই উপলক্ষে আশি সালের ছয়ই জুনের কথা ভেঙে ফুলতে পার না। সেই দিন উপজাতি-বাঙালি রায়টে মামদাইতে সাড়ে চারশো আর বুঝাখাতে দেড়শো বাঙালি মারা গিয়েছিল। আর তারপর থেকে এই অঞ্চল থেকে বাঙালি পালাতে আরম্ভ করেছিল। এখানে আসার পর মনে হচ্ছে ভয়টাকে আমরা অযথাই লালন করে চলেছি। উত্তেজনা যেমন আকস্মিক হয়েছিল তেমনই তার কমে যেতেও বেশি সময় লাগে না। কাশীরের উত্তেজনা যেমন ভারতবর্ষের বাইনতার দিন থেকে শুরু হয়ে এখনও প্রবলভাবে বেঁচে আছে, এক সোটা আছে পাকিস্তানের কারণে, ত্রিপুরায় সেই ধরনের উত্তেজনার কোনও কারণ নেই বলেই আমার বিশ্বাস। বাঙালিদের এই রাজ্যে এইদিনে ত্রিপুরার মহারাজা, তাঁর রাজকাজের প্রয়োজনে। তারা এতকাল এখানে

থেকে এই রাজ্যের মানুষ হয়ে গেছে। উপজাতিদের সে কথাটা কেউ বোঝাতে চায়নি। তুমি বললে, ওরাই বুঝতে চায়নি। যাক গে। এখানে আমি ভালই আছি।

'বেশ কিছুদিন আগে সরকার এখানে হাসপাতালের পরিকল্পনা করেছিলেন। কয়েকটা ছাড়া পুরো বিল্ডিং-ই এখন পুলিশের দখলে। তাদেরই আত্মনা হয়ে গেছে। হাসপাতালের কাজকর্ম গোটা তিনেক ঘরেই চলে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত ওষুধ আছে কিন্তু কর্মচারীর অভাব। আমি ছাড়া আর একজন ডাক্তার আছেন। কিন্তু শুধু ওষুধ দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। বড়সড় ফোড়া অপারেশনের ব্যবস্থা নেই। হোটেলটো অপারেশন করার কোনও উপায় নেই। আমি সার্জেন নই। সহযোগী ডাক্তারও নন। তিনি সাহস পাননি। আমি দুটো কেসে বাধ্য হয়েছি অপারেশন করতে। লোকাল আনাসথিসিয়ার সাহায্যে বড়টুকু সস্তব ততটুকুই। কিন্তু তাতেই পেশেন্ট রিলিফ পেয়েছে। এই ঢালতলোয়ার ছাড়া যুদ্ধ করার ঝুঁকি আছে। কিন্তু সেটা করার গ্রামের মানুষ আমাকে সানন্দে গ্রহণ করেছে। এর ফলে কিছু সমস্যাও হয়েছে। পেটে টিউমার নিয়ে এসে বলছে অপারেশন করে দিতে যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

'বাবা মা যে ভয় পেয়েছিল তার কোনও কারণ আমি দেখছি না। যার কাছ থেকে উপকার পাওয়া ছাড়া তার কোনও কতি ওরা নিচাইই করতে চাইবে না। সামনের শনিবার আমি আগরতলায় যাব। তখন দেখা হবে। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে এসে ঘুরে যেতে পারো। সৌমিত্র।'

খবরবাড়িতে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল বাসুদেব। দৃষ্টিস্তার কিছু নেই, সৌমিত্র ভাল আছে। দু'দিন যানে সে চলে গেল কলকাতায়। অফিসের কাজে। তার কেন্দ্রীয় সংস্থার দুজন বড়কর্তা জাপান ঘুরে সেখানে আসছেন। তাঁরা তার কাছে উত্তরবর্তী ভারতের রাজ্যগুলোতে কীরকম ভাবিতংপরতা চলছে তাই নিয়ে আলোচনা করতে চান। বাসুদেবের সবচেয়ে বড় সুবিধে হল ওর চেহারাের মধ্যে একটি মেলোগিল্যান ছাপ আছে। মোটোমোটা শরীরটা নিয়ে সে নিজেই এমন রসিকতা করতে পারে যে অপরিচিত মানুষ তার কথায় মজা পায়। তা ছাড়া সেই মেঘালয়, মণিপুর, অসমের মানুষের ভাষা সে বহুদূর বলতে পারে। নেপালিটাও। অতএব খবর জোগাড় করতে তার অসুবিধে হয় না। কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে হোটেল আসামার সে নীহার টেলিফোন পেল। বেশ উত্তেজিত হয়ে নীলা বলল, 'কোথায় ছিলে তুমি? সেই দুপুর থেকে ফোমকেই জিজ্ঞাসি। নাদাকে ওরা নিয়ে গিয়েছে।'

'কারা?' বাসুদেব হতভম্ব।
'জানি না। জিপ থেকে নামিয়ে নিয়ে চলে গেছে।'
'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

টেলিফোন নামিয়ে কিছুক্ষণ পাথরের মতো বসে বইল সে। সৌমিত্রর চিঠি পড়ে তো বটেই তার নিজেরও ধারণা হয়েছিল ডাক্তার বলে কেউ ওর কতি করতে চাইবে না। কিন্তু কারা নিয়ে গিয়েছে? ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট না অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স? যারাই কিডন্যাপ করুক তারা আজ না হয় কাল মুখ খুলবে। কিন্তু ততক্ষণ চূপচাপ বসে থাকা যায় না। ওই রাতে কলকাতা থেকে আগরতলায় যাওয়া অসম্ভব।

কালকের রাইটে যে করেই হোক জায়গা পেতে হবে। এমনতেই আগরতলায় যাওয়ার জন্যে জায়গা পাওয়া মুশকিল কিছু তাকে যেতেই হবে।

পুজো আসছে। সহকর্মী ডাক্তারকে একটা দিন চালিয়ে নিতে বলে সৌমিত্র ব্রাহ্মণ্যর বাজার থেকে মাসি টাঙ্কিতে উঠেছিল। ওই মাসি টাঙ্কি সোজা আগরতলায় যায়। অল্প দুপুরের মধ্যে পৌঁছে বিকেলে স্ট্রীকে নিয়ে পুজোর কেনাকাটা করা যাবে। এটা নাকি সে সঙ্গে না থাকলে স্ট্রীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। গাড়িটা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। মোট বারোজন প্যাসেঞ্জার। বাঙালি একজনও নেই। সকল অটোয় গাড়ি ব্রাহ্মণ্য হাড়িয়ে এসেতে লাগল। চারপাশের ঘরবাড়ি শেষ হয়ে গেলে মঠ আর জঙ্গল। সৌমিত্র তাল জাইভার হর্ন দিচ্ছে। সে জানলার পাশে বসেছিল। মুখ বাড়িয়ে তাকাতেই দেখতে পেল দুজন লোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে প্যান্ট আর শার্ট, হাতে গামছা জড়ানো রয়েছে কিছু। জাইভার গাড়ি ধামিয়ে দিতেই ওরা পাশে এসে জাইভারকে নামতে হুকুম করল। ততক্ষণে গামছার ভাঙল কিছুটা সরে গেছে, এক দিঘটি সিঁঙ্গ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। অত্যাধুনিক এই অক্সিজেনট্রি খুব হালকা এবং কার্যকরী ক্ষমতা অনেক বেশি।

ট্রিক তখনই ওপাশ থেকে আরও দুটো লোক নিশ্চয়ই চলে এল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ওরা কিছুকণ খোঁজাখুঁজি করে আদেশ দিল সবাইকে নেমে দাঁড়াতে। সুড়সুড় করে অন্য যাত্রীদের নামতে দেখে সৌমিত্র নামল। লাইন করে দাঁড় করিয়ে ভালভাবে দেখতেই ওরা তার সামনে এসে দাঁড়াল। একজন গম্ভীর গলায় বলল, 'ডাকদর, চলো!'

'কোথায় যাব?' সৌমিত্র খাবড়ে গেল।

'পেপেন্ট আছে, চলো!'

'না। আমি যাব না, পেপেন্ট থাকলে হাসপাতালে নিয়ে এসো, দেখে নেব।'

'আনা যাবে না।' মোকটা ওর হাত ধরে টাঙ্কিতেই সৌমিত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করল। ধরাতাড়তির সময় সে ঘুরি মারেই বাকি দুজন কাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার দুটো হাত পেছনে মুড়ে বেঁধে ফেলল ওরা। তারপর দুই হাতের ফাঁকে লাঠি চুকিয়ে সেই লাঠির প্রান্ত দুজন দৃষ্টিকে ধরে বলল, 'চলো, ডাকদর!'

দৌড় শুরু হল। লোকদুটোর দৌড়ানোর সঙ্গে তাল না রাখতে পারলে দুই বগলে লাঠিটা তীর যন্ত্রণা ছড়াচ্ছে। অথচ দৌড়ানোর অভ্যেস নেই সৌমিত্র। কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? কে তোমরা?'

একজন শান্ত গলায় জবাব দিল, 'পেপেন্ট আছে!'

অশেষাশ্রমে কিছু মানুষ অসল ঢোল তার এই যাতায়াত দেখছে কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করছে না। রাস্তা ছেড়ে ওরা জলাভূমির মধ্যে নেমে পড়েছে। সৌমিত্রর মনে হচ্ছে তার নিশান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দৌড়তে দৌড়তেই শ্বশ্বশ্ব শ্বশ্বশ্ব ও গলার কাছে উঠে এসেছে। গাধাগাছালি তার নজরে পড়ছিল না। এবার ওরা উঠে এল শিচের রাস্তায়। রাস্তাটা ভিত্তিবে ওপারের জঙ্গলে নামবে। এই রাস্তায় প্রায়ই বর্ডার সিকিউরিটির

সৈন্যরা উহল দেয়। সৌমিত্র কাটা কলাপাছের মতো রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ল। সে আর দৌড়তে পারছে না বলে যতটা সময় নেওয়া যায় আর তার মধ্যে যদি টহলদাররা এসে পড়ে এই সুযোগ নিশ্চয়। একজন আচমকা চড় মারল সৌমিত্রর মুখে। কপাল ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'ডাকদর, মারাঠা আইন্য পড়ব। গুলি ছুড়লে জুমিও বাঁচবে না। চলো!'

অতএব আবার দৌড় শুরু করতে হল। এ অঞ্চলের উপজাতি মনুষ্যেরা ফোরটিশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্টরিকে সংক্ষেপে মারাঠা বলেই ডাকে। এই বাহিনী গুলিশের মতো নিয়মকানুনের ধার ধারে না। তাই ওদের উপস্থিতিতে খুব ভয় পূর্ণ স্থানীয় মানুষ।

জুতোর বালি ঢুকে গেছে। সেই বালিতে পা ছড়ে বাচ্ছে। জলে মোকো জুতো ভিজ্ঞ গেছে। সৌমিত্র আর পারছিল না। মাঝে মাঝে কোনও গ্রামবাড়ির পাশে দাঁড়ছিল ওরা জল খেতে। বাড়ির ভেতর চুপেই ওরাই জল নিয়ে আসছিল। বাড়ি বা গ্রামের কোনও মানুষ সৌমিত্রকে দেখলেও বেরিয়ে আসছিল না। পেট ভরে জল খেয়েও তৃষ্ণা ছিল না সৌমিত্রর। সমস্ত শরীর ঘামে চপচপে। শরীর যখন আর পারছে না তখন ওরা দাঁড়াল। জঙ্গলের মধ্যেই বাড়ি। সেই বাড়ির পিছনে জঙ্গলে মধ্যেই চাটাই পেতে তাকে বসতে বলল ওরা। বসার বদলে শুয়ে পড়ল সৌমিত্র। পায়ে জুতো খোলার শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না শরীরে। পড়ামাত্র তার জান লোপ পেলে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে জানে না। যখন চোখ মেলল তখন মাথার ওপর চওড়া প্রাস্টিকের শিট টাঙানো, তার ওপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। দুজন লোক তার দু পাশে বসে ইঁকো বাচ্ছে। তাকে চোখ মেলতে দেখে লোকদুটো হাসল। উঠে বসে জুতো খুলল সে। দুটো পা বালিতে ছড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। এখন তার হাত বাঁধা নেই। এই লোকদুটোর একজনের হাতে এম নির্রাটিন রাইফেল। ত্রিপুরার পুলিশও এইসব অস্ত্র হাতে পায় না। এবার বাড়ি থেকে বাকি দুজন বেরিয়ে এল খাবার নিয়ে। ভাত আর মুগগির মাংস। বলল, 'ডাকদর, খাও!'

চূপচাপ খেয়ে নিল সৌমিত্র। নিদেও পেয়েছিল খুব। খাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কোথায় আছি?'

'পেপেন্ট আছে।'

'সেই পেপেন্ট কোথায়?'

'আছে, আছে।' ধমকে উঠল একজন।

আবার শুরু হল দৌড়। মোকো খুলে শুধু জুতো পুঁজিছিল সৌমিত্র। এবার আর পেছনে লাঠি নেই, দৌড়ানোটাও যেন প্রাণভরে নয়। মাঝে মাঝে বালি দেখলেই থামছে ওরা। জল খেয়ে নিয়ে আবার চলা। সৌমিত্রর সামনে দুজন, পিছনে দুজন। পালিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। এক জীবনে এত দৌড়ানি সে। শেষপর্যন্ত তার হাল দেবে ওরা দৌড়ানো বন্ধ করল। ধুকতে ধুকতে ওরা সঙ্গে নাগাদ যেখানে পৌঁছাল সেখানে এক বাড়িতে আলো জ্বলছে। বাড়ির পিছনে জঙ্গলে প্রাস্টিকের

শিট পাতা হল। আবার স্তরে পড়ল সে। যন্ত্রণায় শরীর কঁকড়ে উঠছে, ঘুম এসে না। বাড়ির ভেতর থেকে মশার ধূপ নিয়ে এসে ছাড়িয়ে দিল অনেকগুলো। দুজন সর্বসময় পাহারায় রয়েছে। ঘটনাক্রমে বাদে চারজন নতুন লোক সেখানে পৌঁছে যেতেই যারা এতক্ষণ তাকে ঘুটিয়ে নিয়ে এসেছে তারা হুচাপ বিদায় নিল।

নতুন চারজনের যে নেতা তার বচস পঁচিশের বেশি নয়। ব্যায়াম করা চেহারা, লম্বা, কোনও মেদ নেই। সোজা সৌমিত্রের সামনে এসে বসল সে, 'গুড ইভনিং ডক্টর। কেমন আছেন?'

'মানে? আমি কেমন আছি? আপনি কি অন্ধ? দেখতে পাচ্ছেন না?' বৈকিয়ে উঠল সৌমিত্র।

'আমি খুব দুঃখিত, বোধহয় আপনার কষ্ট হয়েছে। কিন্তু এভাবে ছাড়া আপনাকে নিয়ে আসা যেত না। আমরা ভ্রমভাবে ভুলকলে আপনি আসতেন? বলুন?' ছেলোটি হাসল।

'আমাকে কেন এনেছেন?'

'দুটো কারণে। প্রথমটা তো আপনি জানেন, একজন পেশেন্টকে চিকিৎসা করতে হবে। দ্বিতীয়টা না হয় খাওয়াপাওয়ার পর বলা যাবে।' ছেলোটি একটা সিগারেট ধরাল।

'আপনি তো ভাল বাংলা বলেন!'

'কী আশ্চর্য? কেন বলব না? আমি মূল কলেজ সব আগরতলায়' করেছে। প্রচুর বাঙালি বন্ধুবান্ধব ছিল আমার। দু-এক পিস কবিতাও বলতে পারি।' ছেলোটি হাসল। সৌমিত্রের মনে হল এর সঙ্গে বেলাতুলি কথা বলা যায়। সে বলল, 'দেখুন, পেশেন্ট দেখতে কেভাবে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে আমি নিজেই পেশেন্ট হয়ে যাচ্ছি।'

'আর হবে না ডক্টর। আমি এসে গেছি।'

এইসময় স্বাবারএল। হারিকেন মূল্যের সেওয়া হয়েছিল গাছের ডালে। রাজ্যের পোকা তার আলোকে ঢেকে ফেলছে। তবু তাতেই যেটুকু দেখা যায় তার মধ্যে খাওয়া শুরু হল। 'তেমন পরিবর্তন নেই, ভাত আর মুরগির মাংস। দুপুরের রান্না' অনেক ভাল ছিল।

খাওয়া শেষ হলে ছেলোটি বলল, 'এবার আপনি ঘুমিয়ে নিন তবে তার আগে কয়েকটা লাইন লিখতে হবে আপনাকে।'

'কী লিখব?'

নেতার নির্দেশে একজন কাগজ কলম এনে দিল। নেতা বলল, 'আপনার বাবাকেই আড্রেস করুন। লিখুন, আমি ত্রিপুরার স্বাধীনতাকামী মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থিচ্ছায় চলে এসেছি। এদের সাহায্য করার জন্যে আমি পঁচিশ লক্ষ টাকা দেব বলে কথা দিয়েছি। এই-চিঠি পাওয়ার বাহ্যন্তর খবরনা মধ্যে ওই টাকা নিয়ে আমাদের বাড়ির ড্রাইভারকে গাড়ি চালিয়ে মান্দারে আসতে হবে। কবে কখন আসবে সেটা এরা আপনাকে কাছ থেকে জানে নেবে। পুলিশ খবর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাতে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য হব এবং বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মুক্ত। নাম সই করে

তারিখ লিখুন।'

লিখতে লিখতে খেমে গিয়েছিল সৌমিত্র, 'অসম্ভব।'

'অসম্ভব শব্দটা মূর্খদের অভিধানে থাকে বলে শুনেছি।' ছেলোটি বলল।

'আপনার আমাকে কিডন্যাপ করেছেন পঁচিশ লাখ টাকার জন্যে?'

'হ্যাঁ। টাকটির খুব প্রয়োজন।'

সৌমিত্রের প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। সে কোনওরকমে নিজেকে সামলাল, 'পঁচিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

'মিথো কথা বলে কোনও লাভ হবে না ডক্টর। আপনার বাবা পুলিশের ডি আই জি ছিলেন। চাকরিজীবনে উনি কী পরিমাণ ঘুষ নিতে পারেন আমরা জানি। ত্রিপুরায় বাঙালি চাকরি করে মাইনের জন্যে নয়, উপরি রোলবার করতে। আর পুলিশের চেয়ে কে বেশি তার সুযোগ পায়? লিখুন।'

'না। আমার বাবা অন্যরকম মানুষ।'

'ঠিক আছে, আপনার বউ দেবে। তার বাবার কাছ থেকে এসে দেবে। তা হলেই আপনি ঠিক পুজোর আগে ওদের কাছ ফিরে যেতে পারবেন। খুব মজা করবেন।'

ছেলোটি থামল।

এদের কাছে অনুরোধ বা কাকূতিমিনতি করে কোনও লাভ হবে না। সৌমিত্র অন্য পথ ধরল। সে হাসল, 'আপনি পাগল হয়ে গেছেন।'

'মানে?'

'পৃথিবীতে আর্য যদি সবচেয়ে সুখী কোনও মানুষ থাকে সে হচ্ছে আমার স্ত্রী।'

'আপনার স্ত্রী?' ছেলোটি হকচকিয়ে গেল।

'কিডন্যাপের খবরটা পাওয়ায়ামাত্র সে আদ্রোদে আটখানা হয়ে লাফাবে। ভগবানকে ডাকবে যাতে আমি যেন কোনওদিন ফিরে না যেতে পারি। টাকা না দেওয়ার জন্যে যদি আমাকে মেরে ফেলা হয় তা হলে তার জন্যে ও পুজো দেবে। মরে গেলে আমার সমস্ত ইনসুরেন্সের টাকা, অমিস থেকে যা পাওয়ার সব হাভাবে। তারপরে বিধবা হলেও আবার বিয়ে করতে তো আপত্তি নেই।'

সৌমিত্র অভিনয় করার চেষ্টা করল।

'বাজে কথা। একদম বাজে কথা।' ছেলোটি প্রতিবাদ করল।

সৌমিত্র লজ্জা করল তার কথাগুলো বাকি তিনজন মন দিয়ে শুনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। সে বলল, 'একটু ভেবে দেখুন। আমি আগরতলায় ডাক্তারি করতাম। আমার বাবা ডি আই জি ছিলেন। আমি কেন বদলি হয়ে বুরাখাতে আসব? যে কোনও বাঙালি বুরাখা কিংবা মান্দারের নাম শুনেই আঁতকে ওঠে। কিন্তু আমি এসেছি আর আমার স্ত্রী কোনও বাধা দিল না। কোনও স্ত্রী সেটা করবে? সে তো বলতেই পারত চাকরি ছেড়ে দিয়ে আগরতলায় ভূমি প্রাকটিস করো। বলেনি। সে চাইছিল আমার কিছু একটা হয়ে যাক। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলে এইরকম হয় ভাই।'

ছেলোটি কয়েক সেকেন্ড ভাবল। তারপর বলল, 'লেখাটা শেষ করুন।'

'এর পরেও লিখতে বলছেন?'

‘হ্যাঁ। আমার ওপর অর্ডার আছে আজই আপনার চিঠি পাঠাতে হবে। লিখুন।’
বনানীটা ঘোরাবার চেষ্টা করল সৌমিত্র। কিন্তু ছেলেটি প্রচণ্ড ধমক দিল। অন্তঃকরণে কথামতো লিখতে হল।

চিঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলেটি, ‘এখন আপনি ঘুমতে পারেন। আমরা তিন রাত তিনটের সময় রওনা হব। আর একটা কথা, পালাবার চেষ্টা করবেন না। আমরা যেখানে আছি তার কড়ি মাইলের মধ্যে কোনও বাঙালি নেই। অতঃপর ধরা আপনাকে পড়তেই হবে।’

‘আমি নির্বেশ নই যে পালিয়ে বিপদ ডেকে আনব।’

‘ধন্যবাদ।’ ছেলেটি চলে গেল।

সৌমিত্র বাকি তিনজনকে দেখল। চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে প্রথমজনকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কি বিয়ে করছে?’

সোকটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে একটি দূরে গিয়ে বসল। সৌমিত্র বুঝল, এদের উপর নির্দেশ আছে তার সঙ্গে কথা না বলতে। অথবা ভাল বাংলায় এরা কথা বলতেই পারে না। পার্বত্য ত্রিপুরার উপজাতিরা এখন বাধা না হলে বাংলা বলবে না। সে শুয়ে পড়ল। মাথার ওপর জঙ্গলের আড়ালের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ। সেখানে তারা ছলছে। সৌমিত্র ভেবে পাচ্ছিল না এই চিঠি বাড়িতে পৌঁছেলে সেখানে কী কাণ্ড ঘটবে।

আগরতলায় পৌঁছে সোজা শওরবাড়িতে চলে এল বাসুদেব। বাইরের ঘরে তখন বিধবতু পি বি তাঁর পরিচিত কয়েকজন পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে কথা বলছিলেন। জামাইকে দেখে গভীর হয়ে গেলেন শওরমাশাই। বললেন, ‘আমার কথা তোমারা তুললে না। তুললে আলু এই অবস্থা হত না।’

‘আপনি চাননি সৌমিত্র ওখানে যাক।’ নিচু গলায় বলল বাসুদেব।

‘হ্যাঁ, কেন চাইনি তা এখন বুঝতে পারছ তো?’ তার চিঠি পড়ে তুমি বড় গলায় বললে, দৃষ্টিস্তার কিছু নেই, সৌমিত্র ডাঘ আছে। এখন কী বলবে তুমি?’ পি বি-কে খুব হতাশ মনে হচ্ছিল।

‘ওরা যে একজন ডাক্তারকে কিডন্যাপ করবে আমি ভাবতে পারিনি। এর আগে কোনও ডাক্তারের দিকে ওরা হাত বাড়ায়নি। কিন্তু কারা ওকে কিডন্যাপ করছে তা কি জানতে পেরেছেন?’

মাথা নাড়লেন পি বি। এক পুলিশকর্তা বললেন, ‘কেউ ক্রেমই করছে না। মুশকিল হয়েছে কিন্তু সমাজবিরোধী একটা টিম করে জঙ্গিদের কয়েদার কিডন্যাপ করে টাকা হাভাবার চেষ্টা করছে আত্মকল্যাণ। ওদের কেউ হলে কিছুই জানা যাবে না।’

বাসুদেব বলল, ‘তা হলে আপনারা এখন কী ভাবছেন?’

পি বি বললেন, ‘কিছুই ভাবতে পারছি না। বাবা হয়ে আমি কখনওই চাইব না আমার ছেলের মৃত্যু হোক। যেমন করে হোক ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।’

আর একজন পুলিশকর্তা বললেন, ‘কাল রাতে আমরা সমস্ত বুরাখ চাবে ফেসেছি কিন্তু সৌমিত্রকে পাওয়া দূরের কথা, কোনও সূত্র খুঁজে পাইনি। কেউ মুখ খুলতে

২৬

চায়নি। ঘটনাটা যে ঘটেছে তাই কেউ জানে না।’

বাসুদেব অন্দরমহলে চলে এল। শান্তি তাঁর খাটে শুয়ে কেঁদে চলেছেন। সৌমিত্রর স্ত্রী মাথার হাত দিয়ে তাঁর পায়ের পাশে বসে আছে। ওকে দেখে নীলা এগিয়ে এল, ‘কী হবে?’

বাসুদেব কেনও উত্তর দিল না। তার উপস্থিতি টের পেয়ে শান্তি সশব্দে কেঁদে উঠলেন, ‘আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। আমি ওকে যেতে দিতে চাইনি, তোমারা কেউ ওকে বাধা দাওনি। আমরা ছেলে যদি মরে যায়, ও ভগবান, আমার কী হবে।’ গোড়ান্নির স্বরে কাঁদা চলল।

নীলা গিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরল, ‘মা শব্দ হও, ও এসে গিয়েছে, একটা কিছু ব্যবস্থা হবে।’

‘বাসুদেব কী করবে? ও তো রিপোর্টার। তোর বাবাই কিছু করতে পারছে না। কোনও খবরই নিয়ে আসতে পারছে না। আমার সব শেষ হয়ে গেল—।’ শান্তি ছিঁপতে লাগলেন।

সৌমিত্রর স্ত্রী উঠে এল বাসুদেবের সামনে, ‘আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।’

‘কী করব?’ অসহায় গলায় বলল বাসুদেব।

‘আমি জানি না। ওর কিছু হলে আমি আত্মহত্যা করব!’ শব্দ গলায় বলল মেয়েটি।

টিক তখনই বাইরের ঘর থেকে চিংকার ভেসে এল। পি বি-র গলা। কাউকে ডাকছেন, কাকে ডাকছেন তা বোঝা যাচ্ছিল না। ওরা ছুটল, এমনকী শান্তিও।

পি বি দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটা চিঠি। একজন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কিন্তু এটা যে আপনার ছেলের লেখা সে ব্যাপারে কি আপনি নিঃসন্দেহ?’

‘ওহেল, আমি তো অনেকদিন ওর হাতের লেখা দেখিনি।’ পি বি মাথা নাড়লেন। তারপর ওদের দেখতে পেয়ে বললেন, ‘গার্ভাট এমন ইডিয়ট যে এই অবস্থায় কে একজন ছুটতে চড়ে গেটের কাছে এসে আমাকে একটা খাম পৌঁছে দিতে বলল আর সে তাকে ছেড়ে দিল। লোকটাকে ধরতে পারলে খোকাকে খুঁজে বের করতে সুবিধে হত।’ পি বি আবার উত্তেজিত হলেন।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, ‘কর চিঠি এসেছে?’

‘খোকর।’ বদেই পি বি সঙ্গেদধর করার চেষ্টা করলেন, ‘যদিও আমি নিশ্চিত নই এটা ওর লেখা। বউমা, দেখো তো, এটা খোকর হাতের লেখা কিনা!’

সৌমিত্রর স্ত্রী চিঠিটা নিয়ে চোখের সামনে ধরল। চাইনিগুলো পড়েই সে কেঁদে উঠল। সেই অবস্থায় মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বাসুদেব বলল, ‘সৌমিত্র কিছুদিন আগে আমাকে চিঠি লিখেছিল। ওর হাতের লেখা আমার মনে আছে, দেখি।’

সে হাত বাড়তে সৌমিত্রর স্ত্রী চিঠিটা দিয়ে দিল। চিঠি পড়ে বাসুদেব মাথা নাড়ল, ‘হ্যাঁ, এটা সৌমিত্রর হাতের লেখা, কোনও সন্দেহ নেই।’

শান্তি বাইরের লোকের উপস্থিতি উপেক্ষা করে চোঁচিয়ে উঠলেন, ‘আমি, কী লিখেছে, আমাকে বল।’

সৌমিত্রের চিঠি পড়ল বাসুদেব, ‘শ্রীচরমেয় বাবা, আমি ত্রিপুরার স্বাধীনতাকামী

২৭

Prince

মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বইচ্ছার চলে এসেছি। এদের সাহায্য করার জন্যে আমি পাঁচিশ লক্ষ টাকা দেব বলে কথা দিয়েছি। এই চিঠি পাওয়ার বাহ্যিক ঘটনার মধ্যে ওই টাকা নিয়ে আমাদের বাড়ির জাইভারকে গাড়ি চালিয়ে মান্দারের আসতে হবে। কবে কখন আসবে সেটা এরা আপনার কাছ থেকে কোনো জেনে নেবে। পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাতে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য হবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। সৌমিত্র বসু, তারিখ...

এক পুলিশকর্তা বললেন, 'একটা প্রান করা যাক। টাকার বদলে ছেঁড়া কাগজ সুটকেসে পুরে আপনার জাইভার মান্দারের যাবে। ওরা নিশ্চয়ই ফোন করে জেনে নেবে কবে যাবে। সেইমতো আমরা সমস্ত মান্দার কর্তার করে রাখব। ওরা যেই জাইভারের কাছে টাকা নিতে আসবে তখনই ওদের ধরে ফেলতে পারব। আর ধরা পড়ার পর আমাদের চাপে ওরা বলতে বাধ্য হবে সৌমিত্রবাবুকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। অনেক সহজ হয়ে পেল সমস্যাটা।'

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'অফিসার, আপনি অনেকদিন মান্দারের যাননি, না?'
'কেন? কেন?' ভদ্রলোক জ্ঞ কৌচকালেন।
'আপনি যেই মান্দারের স্বাভাবিক পুলিশি ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবেন তখনই ওরা বুঝে যাবে উদ্দেশ্য কী। কেউ আমাদের জাইভারের সামনে আসবে না।'
'ওরা খবর পেয়ে যাবে বলছেন?'

'ওদের গোয়েন্দা দপ্তর আপনারদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।'
পি বি বললেন, 'কী কথি। মাত্র বাহ্যিক ঘটনা। এর মধ্যে এত টাকা কী করে জোগাড় করি। সারাজীবন চাকরি করে আমি তো ওর অর্ধেক টাকাও জমাতে পারিনি।'

শান্তি বললেন, 'তুমি আমার গয়নাগুলো নাও। কিন্তু তো পাওয়া যাবে। যে করবেই হোক খোকাকে খিরিয়ে আনতে হবে।'

সৌমিত্রর স্ত্রী বলল, 'আমরা গয়নাগুলো দিচ্ছি। ব্যাংকে আমার নামে যে টাকা আছে—!'

বাসুদেব বাধা দিল, 'কী আশ্চর্য! আপনার পাঁচিশ লাখ টাকা দেখেন নাকি?'

'নিতে হবে। কিন্তু কীভাবে দেব জানি না।' পি বি বসে পড়লেন।

একজন অফিসার বললেন, 'কিন্তু স্যার, আপনি র্যানসম দিয়েছেন জাদাখানি হলে বিক্রয় প্রতিক্রিয়া হবে। মানুষ আত্ম হারিয়ে ফেলবে।'

'আর আত্ম! আমরা সাধারণ মানুষকে কেনও প্রটেকশন দিতে পেরেছি? এই সেদিন একটা পানের দোকানের মালিককে ওরা তুলে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইল। ওর বউ মেয়ে এসে আমাদের কাছে কাছাকাটি করল। কী করতে পেরেছি আমরা? শেষপর্যন্ত দোকান বাড়ি বিক্রি করে টাকা নিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল কটকটে।' পি বি উত্তেজিত গলায় বললেন।

'কিন্তু স্যার, ওরা যা চাইছে তাই দিলে ওদের দাবি আরও বেড়ে যাবে।' আর একজন অফিসার বললেন।

'ওরা যা চাইছে তাই দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।' পি বি মাথার হাত দিলেন।

অফিসাররা উঠলেন। যাওয়ার আগে অনুরোধ করে গেলেন এখনই কোনও সিদ্ধান্ত না নিতে। এখনও বাহ্যিক ঘটনা সমাধা আছে। ভেবেচিন্তে একটা পথ বের করতে হবে। পি বি তাঁদের মনে করিয়ে দিলেন যে তিনি তার ছেলের ব্যাপারে পুলিশের কাছে কোনও ভায়েরি করেননি। অতএব এই ব্যাপার নিয়ে পুলিশ যেন এখনই সক্রিয় না হয়। ওরা চলে গেলে নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু বাবা, পুলিশ কি কিছুই করতে পারবে না?'

শ্রান্তনু ডি আই জি চোখ বন্ধ করলেন, 'সত্যি কথাটা আমাকে দিয়ে নাই বা বললেন মা।'

শান্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে টাকার কী ব্যবস্থা হবে?'

'জোগাড় করতে হবে। ওরা যদি ফোন করে তা হলে অনুরোধ জানাব পরিমাণটা কমাতে। শুধুবে কি না তা জানি না। না হলে ধার করতে হবে। আমাদের নতুন বাড়িটা বন্ধক রেখে টাকা নেব।' পি বি বললেন।

শান্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'নীলা, তোরা কিছু দিতে পারবি না?'

নীলা বাসুদেবের দিকে তাকাল। বাসুদেব বলল, 'আমাদের পক্ষে যা সম্ভব তা নিশ্চয়ই দিতে পারি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, টাকা পেয়ে ওরা সৌমিত্রকে ছাড়বে তার কী গ্যারান্টি আছে?'

'তার মানে?' সৌমিত্রর স্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'যারা আন্দোলনের নামে সাধারণ মানুষকে কিডন্যাপ করে টাকা রোজগার করছে তাদের কোনও আদর্শ আছে বলে আমি মনে করি না। ওরা মিথ্যাচার করতে পারে। এর আগেও তো এমন ঘটনা হয়েছে। টাকা পাঠানোর পরেও লোকটাকে পাওয়া যায়নি।' বাসুদেব বলল।

পি বি বললেন, 'সেই ভদ্রলোক আগে থেকেই অসুখে ভুগছিলেন। বন্দিদশায় সেটা বেড়ে যায়। ওহুধ পাওয়া যায়নি। ওরা মারেনি, বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন ভদ্রলোক।'

'হ্যাঁ, এটা ওদের বক্তব্য। টাকা পাওয়ার পরেও মৃতদেহের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা যারা চাইতে পারে তাদের আমি বিশ্বাস করি না।' বাসুদেব বলল।

'কিন্তু বিশ্বাস না করে কোনও উপায় তো নেই বাসুদেব।' পি বি বললেন।

'আমি টাকা দেওয়ার বিরোধী।' বাসুদেব বেশ জোরে বলল।

শান্তি চিৎকার করলেন, 'কিন্তু টাকা না পেলে ওরা খোকাকে মেরে ফেলবে যে।'

'পেলেও তো মারতে পারে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' ভদ্রমহিলা কঁদে ফেললেন।

'তুমি কী করতে বলছ? পি বি অসহায় গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমাকে সাতটা দিন সময় দিন।'
'সাতদিন? শুনে ওরা বাহ্যিক ঘটনা মানে তিনটে দিনের মধ্যে টাকা চায়।'
'যারা টাকা চেয়েছে তারা জানে বলামাত্রই পাঁচিশ লাখ টাকা পাওয়া যায় না। জোগাড় করতে সময় লাগে। ওরা ফোন করলে আপনি রাজি হবেন টাকা দিতে কিন্তু

জোগাড় করতে সময় লাগছে বলে যে কদিন পারেন ম্যানেজ করবেন।' বাসুদেব বলল।

'কিন্তু এই সাতদিনে তুমি কী করতে পার?' শি বি জিজ্ঞাসা করলেন।

'সেটা আমাকে ভাবতে দিন। আমি এখন বাচ্ছি, যা বললাম তা যদি না করেন তা হলে পরিণতির জন্যে আপনারাই দায়ী থাকবেন। শীলা, তোমার এখন এখানে থাকা উচিত। যাচ্ছি।' বাসুদেব বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

অন্ধ্রভূমি নগর থেকে হরিগঙ্গা রোডে চলে আসার সময় বাসুদেব ডেবে পাচ্ছিল না ঠিক কী করা যায়। বাড়ি এসে সে আলমারিৎ ঘেঁষি এবং ই-মেইল চেক করল। কোনও খবর নেই। ঠিক করা এই কাজ করেছে তা প্রথমে বের করা দরকার। পঁচিশ লাখ টাকা দিতে শুল্কস্বাড়ির সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। যারা অন্সায় করে, ভয় দেখিয়ে টাকা চায় তারা যদি টাকা না পায় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে মাকে কিডন্যাপ করে এনেছে তাকে খুন করতে পারে না। টাকা পাওয়ার আশায় পরিমাণটা কমিয়ে চাপ দেয়।

কিন্তু করা করেছে কাজটা? বুঝাযেতে গেলে খবরটা পাওয়া যাবে না। অঞ্চল খেফ জেদের বশে সে সাতটা দিনের সময় চেয়েছে। কিন্তু একটা করতে হবে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে ওর চোখের সামনে সুরেন্দ্র দেবনাথের মুখ মনে পড়ল। সুরেন্দ্র একসময় তার সহপাঠী ছিল। কিন্তু সাফল্য পায়নি। বছর তিনেক আগে বাসুদেবের কাছে বলেছিল কোনও কাজের জন্যে। সেসময় মান্দাই-এ পুলিশ ক্যাম্পের জন্যে একটা ক্যানটিন খোলার পরিকল্পনা হয়েছিল। বাসুদেব সেটা জানত। ওপরের তলার কর্তৃদের অনুরোধ করে সুরেন্দ্রকে কাজটা পাইয়ে দিয়েছিল সে। সুরেন্দ্র দেবনাথ বেশ ভালভাবেই সেই ক্যানটিন চালাচ্ছে। সুরেন্দ্র কি খবর দিতে পারে? উপজাতি শ্রেণীর মানুষ হলেও সুরেন্দ্রর সঙ্গে যে কোনও জাতি সংঘর্ষের যোগাযোগ নেই সে ব্যাপারে বাসুদেব নিঃসন্দেহ। একসময় স্লেপাধুরা করতে সে। ফুটবলটা ভালই খেলত। কিন্তু যত ভাল খেললে চাকরি পাওয়া যায় ততই চাকরি পেতে হলে কর্তৃদের যেসব হুকুম জামিল করতে হয় তা করেনি বলেই পাটাইই বা টেম্পোরারি চাকরির বেশি কিন্তু জোটটিন। খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর কোচদের সহকারী হিসেবে লেগেছিল এই আশায় যে ডবিঘাটে কোচ হবে।

গ্যারেজ থেকে মারুতি বের করল বাসুদেব। মান্দাই যাচ্ছে বললে পরিচিত কেউ গাড়ি চালাতে চাইবে না। অথবা গ্লেশের সামনে দাঁড়াতে হবে। তার নিজের ড্রাইভার উপজাতি শ্রেণীভুক্ত হলেও এখন প্রায় বাঙালি হয়ে গিয়েছে। ও তো যেতেই চাইবে না, উলটে পাঁচজনকে বলে বেড়াতে পারে।

মান্দাই পৌঁছোতে একটু বেশি সময় লাগল। তখন রেনা তিনটে। কোনওদিকে না আকিয়ে সে সোজা জেল গেল যাটদিনারের ক্যানটিনে। দুপুরের খাওয়া শেষ হওয়ায় তখন ক্যানটিনে ভিড় নেই। দু-তিনজন সেপাই বসে চা খাচ্ছিল। কাউটারের পেছনে বসে হিসেব করছিল সুরেন্দ্র, বাসুদেবকে দেখে অবাক। ষটপট উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি? এখানে?'

'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে!'

সুরেন্দ্র একবার চারপাশে তাকিয়ে নিল। পুলিশ বাসে তার যেসব কর্মচারী এখানে কাজ করছে তারা সবাই উপজাতির। একজন বাঙালি গাড়ি চালিয়ে এসেছে, এমন বাকী আত্মকাল মান্দাই-তে ঘটে না। সে হাঁক দিল চা বানাতে। তারপর বলল, 'বসো।'

বাসুদেব চেয়ার টেনে বসে বলল, 'এদিকের হওয়া কেমন?'

'ভাল।'

'শোনো সুরেন্দ্র। আমি তোমার হেল্প চাই। গতকাল এখানকার ডায়ালককে কিডন্যাপ করা হয়েছে এই খবর তোমার জানা। কিন্তু তুমি বোধহয় জান না ওই ডায়ালকের আমার নিজের শালা।' বাসুদেব বলল।

'জানি। লোকের বলত ডায়ালকবাড়ি আই জি-র ছেলে। কিন্তু দৈত্যকুলে প্রহর। আর ডি আই জি যে তোমার শুল্ক ও এখবর তো জানাই ছিল।' সুরেন্দ্র বলল।

'ডায়ালককে কারা ধরে নিয়ে গেছে?'

'বিশ্বাস করো, আমি জানি না। খানাটা বন্ধন ঘটে তখন আমি এই চেয়ারে বসেছিলাম। বুঝাযাং হাটা থেকে ওকে তুলেছে ওরা। হাট্টিয়ে নিয়ে গিয়েছে কিন্তু কেউ বলছে না কারা নিয়ে গিয়েছে।'

'খবরটা জোগাড় করতে তোমার কতটা সময় লাগবে? বারো ঘণ্টা?'

'ঠোটা করতে পারি। তুমি তো জানো খবর নিতে চাইছি জানাজানি হলেই আমার মৃত্যু অনিবার্য। তবু, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, আমি চেষ্টা করছি।'

চা এল। সঙ্গে বিড়ুটা। সুরেন্দ্র নিচু গলায় বলল, 'তোমার এভাবে মান্দাইতে আসা ঠিক হয়নি। আমাদের আগরতলায় ডেকে পাঠাতে পারতো।'

'সময় নষ্ট হ'ত।' চায়ে দুই চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমার মোবাইল নম্বরটা জান? শুভ।'

বেরিয়ে এল বাসুদেব। গাড়ি চালু করে মান্দাই বাজারের পাশ দিয়ে ঘিরে যাওয়ার সময় তার মনে হল, এই জায়গাটার নাম ভারতবর্ষ। অঞ্চ ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস কোনও বাঙালির নেই।

ঘিরে আসার পথে কোনও বাধা এল না। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল, এখান থেকে মাইলখানেক ভেতরে গেলেই নোয়াঙ্গের গ্রাম। এই নোয়াঙ্গ লোকটা ফ্রান্স। উপজাতি হয়েও পড়াশুনার ভাল বলে শেখপর্শ্ব সিডিল ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিল। সরকারি চাকরি পেয়েছিল সহজেই। কিন্তু বছর দুজনের মধ্যেই ঋণ্ডা করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেরই ব্যবসায় নামে। কিন্তু ব্যবসাও স্কিমভাটা হচ্ছিল না। এইসময় এক বন্ধুর মারফত ওর সঙ্গে আলাপ হয় বাসুদেবের। বাসুদেব তাকে দুটো বড় কন্ট্রাই পেতে সাহায্য করেছিল। লোকটা যে অকৃতজ্ঞ নয় তা বাসুদেবের বোকাতে চোটা করেছে কিন্তু বাসুদেব তাকে নিরাশ করেছে। আজ বাসুদেব গাড়ি ঘোরাল। কন্ট্রাইকশনের কাজ যে করে সে যে বাড়িতে থাকবে এমন ভাবা ঠিক নয়, তবু যদি সেখা পাওয়া যায়।

দুপাশে চাঘের জমি, গাছগাছালি পেরিয়ে যখন বাসুদেব নোয়াঙ্গের বাড়িতে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা। প্রথমবার আসার অন্তত তিনটি মানুষকে জিজ্ঞাসা করে হদিশ

জানতে হয়েছে। তিনজনেই তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছে। এই অঞ্চলে এসময়ে বাঙালি ঢোকে না। আদিবাসী বা উপজাতি মানেই কোনও জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হয়। জঙ্গিদের কাজকর্ম সমর্থন করে না এমন লোক প্রচুর আছে। যেমন নোয়াস। কিন্তু নোয়াসের একটি ব্যাপার এখনও তার কাছে স্পষ্ট নয়। তৃতীয় যে কাজটা সে পাইয়ে দিয়েছিল সেটা বেশ বড় ধরনের। প্রচুর টাকার মূলধন দরকার। বন্ধু বলেছিল, ছেলেরা খুব পরিশ্রমী, উদ্যোগী কিন্তু ওর মূলধন কম। সেটা শুনে ইতস্তত করছিল বাসুদেব কিন্তু নোয়াস বলেছিল, 'টাকার জন্য চিন্তা নাই। সুদ দিলেই পাওয়া যায়।' বাসুদেব বলেছিল, 'কুড়ি লাখ টাকা ধার দেওয়ার লোক এখানে আছে?'

'কুড়ি? কয় কুড়ি চান?' হেসেছিল নোয়াস।

নোয়াসের বাড়িটা কিন্তু একতলা, মোটামুটি। ওর বাবা জানাল নোয়াস আগরতলায় গিয়েছে কিন্তু সস্তের মাথেরি ফিরবে। বাসুদেব পরিচয় দিতেই ভদ্রলোক চিনতে পারলেন, 'আপনার কথা খুব শুনিছি। ওরে তো আপনিই হেল্প করছেন। আপনাকে খুব মানে সে। বসেন, বসেন।'

বাসুদেব বলল, 'ওর তো ফিরতে অনেক রাত হতে পারে কিন্তু বুঝতেই পারছেন আমার পক্ষে রাত করা সম্ভব নয়।'

'তাইলে রাতে আর যাওয়ার দরকার কী। এখানেই থাকেন।'

বাসুদেব হাসল, 'তা হয় না। বাড়িতে কামাকাটি শুরু হয়ে যাবে।'

'কিন্তু বলার আছে ওরে?'

'না থাক। ও হ্যাঁ, নোয়াস নিশ্চয় ওর সেকেন্ড কাজটা শেষ করে ফেলেছে?'

বুড় হাসলেন, 'হ্যাঁ। টাকাও শোধ করছে, সুদ সমেত।'

'তাই? এত টাকা কে দিল?'

'কে আর দিবে? অটো-মেশিন মানুষের হাতে তো এখন কোটি তোটি টাকা।

তারাই টাকা খাটায়। টাকার টাকা বাড়তে তাদের। বুঝতেই পারতেছেন।'

খুব সাহস করে নামটা উচ্চারণ করল বাসুদেব, 'টাইগার?'

'না, ওদের কাছে কোন যাব? না না।' বুড় আর ভাঙল না। ঠিক তখনই জিপের

হেডলাইট দেখা গেল। জিপ থামলে এগিয়ে এল নোয়াস, 'আপনি? কী ব্যাপার?'

'এদিকে এসেছিলাম, ভালোম দেখা করে যাই।'

নোয়াস কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'স্ববরটা শুনলাম।'

'কারা কিডন্যাপ করেছে জান?'

'না। তবে ন্যাশনাল লিবারেশনের কেউ করেনি সে ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি।'

'তা হলে টাইগার?'

'হতে পারে। আবার দু'নম্বর জঙ্গিদের সংখ্যা তো রোজ বাড়ছে। তারাও হতে পারে।'

'স্ববরটা আমার দরকার নোয়াস।'

'ঠিক আছে। আজ রাতের মধ্যে পাবেন। কিন্তু আপনার তো এক আগরতলায় যাওয়া উচিত হবে না। রাতে এখানে থেকে যান।' নোয়াস বলল।

৩২

'নো। সেটা সম্ভব নয়।'

নোয়াস তাকে অপেক্ষা করতে বলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বুড় চুপচাপ শুনিছেন। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিভাবে নিচ্ছে?'

'আমার শালাকে।'

'কত টাকা?'

'পঁচিশ লাখ।'

'হুইছে। লোভ বাড়তেছে প্রতিদিন। আহা, কত বরষ?'

'তিরিশ।'

'আহা। বিয়াসাদি ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আহা।' যেন কোনও মৃত মানুষের জন্যে শোক করছেন বুড়। নোয়াস ফিরে এল, 'দাদা, আমার গাড়ি আপনাকে এসকর্ট করবে। চারজন থাকছে গাড়িতে। পুলিশ খোঁজা করলে সামলে দেবেন।'

'ধন্যবাদ। তোমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করব।'

সামনের গাড়িটিকে অনুসরণ করছিল বাসুদেব। শহরের মুখে পৌঁছে নোয়াসের গাড়ি ফিরে গেল। ফলে কোনও ঘটনা ঘটেনি। জঙ্গির দূরের কথা পুলিশ পর্যন্ত তাদের চ্যালেঞ্জ করেনি।

বাড়ি ফিরে আনসারিং মেশিনে নীলার গলা গেল সে। অনেকবার ফোন করেছে, না পাওয়ায় সবাই উদ্বেগ। বাসুদেব স্বস্তরবাড়িতে ফোন করল, 'একটু কাজে বেরিয়েছিলাম। তোমাদের ওখানে নতুন কোনও খবর আছে?'

নীলা বলল, 'না। শোনো তুমি যেনোই যাবে অকত চারঘণ্টা বাসে বাসে আমাকে ফোন করবে। দুই সেকেন্ডের জন্যে হলেও করবে। আমার খুব ভয় করছিল।'

বাসুদেব হাসল, 'ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছুই নয়।'

'শোনো, আমাদের উচিত বাবাকে সাহায্য করা। অবশ্য আমি তোমাকে জোর করতে পারি না। এটা আমার বাপের বাড়ির ব্যাপার। কিন্তু বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের সময় আমাকে যা দিয়েছিল তা যদি ফিরিয়ে দিই তা হলে তুমি কি রাগ করবে?'

'এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় এখনও আদেনি নীলা। আমার মোবাইল বাজছে, রাখছি।'

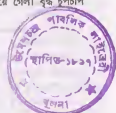
রিসিভার রেখে দিয়ে মোবাইল অন করল বাসুদেব। দুবার অজুত ধরনের ব্যক্তি শব্দ বাজার পর তখন রিয়ান-এর গলা শোনা গেল, 'রিপোর্টার!'

'বলছি।'

'তোমাদের বক্তব্য রেডিঘোটে শুনলাম। এখন বলো তো, সাহেবদের ধারণা না তুমি তাদের বুঝাইছ কাম্ব্রিয়ারের প্রব্রেম আমাদের থেকে অনেক বেশি? কও তুমি।'

'আমি কিছু বুঝাইনি। তোমাদের সমস্যা তোমাদের মতো, কাম্ব্রিয়ারের সমস্যা তাদের মতো। আমি সারাদিন ছিলাম না, রেডিঘো শুনিনি, টিভি দেখিনি, আমি ত্রুণ করছি।'

৩৩



Hasan

‘হু, করো। রিপোর্টার, সাহেবদের বুঝাও।’

‘কিন্তু তপন, এটা কি ঠিক করলে?’

‘কী রিপোর্টার?’

‘তোমার শালাকে তুলে নিয়ে গেলে?’

‘তোমার শালা?’

‘হ্যাঁ, বুঝাশ ডাক্তার।’

‘এ কী কথা। আমি তো প্রথমবার শুনেছি। না না, তুমি ভুল শুনেছ, আমাদের কেউ এসব করে নাই। আজকাল তো আদর্শ কেউ মানে না। পাঁচজন এক হইলেই কিডন্যাপ করে। তবু, আমি দেখতেছি, তোমার শালা যখন তখন সেইখতে লাগে।’
লাইন্সটা কেটে দিল।

তপন রিয়ার টাইগার গ্রুপের জনসম্মোহনের দায়িত্বে। তার সবসময় বাসনা বাসুদেব সারা পৃথিবীতে তাদের খবর প্রচার করুক। লোকটা ফোন করে মোবাইলে। ক্যাশ কার্ড কিনে মোবাইলে কথা বললে যে নাযার পাওয়া যায় তাকে ধরা অসম্ভব। যে কেউ যে কোনও নামে ক্যাশ কার্ড কিনতে পারে। এবং কখনওই একই ক্যাশ কার্ড থেকে সে ফোন করে না। সম্ভবত যে ক্যাশ কার্ড শেষ হয়ে এসেছে সেটি ব্যবহার করে। কথা বলার পর ফেলে দেয়।

তপন রিয়ার টাইগারের নাম বাসুদেব বগেছিল অঙ্কবাক্যে ডিল ছুড়তে। যদি লেগে যায়। লোকটা এক দূর্ত যে ঠিক পাশ কাটিয়ে গেলে।

রাত দশটার পর দুটো ফোন এল। প্রথমটা সুরেন্দ্র সেবনাথের। বলল, ‘দাদা, খবর পেয়েছি। ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে চারজন আর্মড লোক নিয়ে গিয়েছে জীবন সর্দার পাড়া, রতনপুরের দিকে। লোকগুলো কোন দলের বোকা যাচ্ছে না।’ বাসুদেব ধন্যবাদ দিল। জীবন সর্দার পাড়া, রতনপুর মানে ওয়া বাংলাদেশ বর্ডারের দিকে এগিয়েছে। বর্ডার পার হলে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় ফোনটা মোয়াদের। সে বলল, ‘দাদা, আমি ঠিক বলেছিলাম। কাছটা ন্যাশন্যাল পার্টির নয়। চারজন লোক ডাক্তারকে নামিয়েছে। কোথায় নিয়ে গিয়েছে কেউ জানে না।’

‘আমি খবর পেয়েছি ওকে জীবন সর্দার পাড়া—রতনপুরের দিকে নিয়ে গেছে।’

‘তা হলে তো প্রহরেন সলভড।’

‘তার মানে?’

‘ওইসব এলাকা টাইগারদের দখলে। ওখানকার নেতার নাম জেস্টার।’

‘তুমি নিশ্চয়ই?’

‘ওই এলাকায় ন্যাশন্যাল পার্টির কোনও বেস নেই। টাইগাররাই অপারেট করে।’

‘গ্যাং ইউ।’

টেলিফোন নামিয়ে রেখে ভাবতে শুরু করল বাসুদেব। পুলিশ এবং বি এস এফ—এর সাহায্য নিয়ে এখনই ওই সীমান্তে তরাসি চালানো যায়। কিন্তু তাতে পাওয়ার সম্ভাবনা আরও কমে যাবে। ওদের কাছে ঠিক খবর পৌঁছে যাবে।

পাঁচ লাখ টাকা না পেলে ওরা কি সৌমিত্রকে মেরে ফেলবে? বাসুদেব বিশ্বাস করছিল না। ওরা নিশ্চয়ই টাকার অঙ্ক কমাবে। অপেক্ষা করবে। একটা অপারেশন

বুঝি যাবে এটা নিশ্চয়ই ওরা চাইবে না। অতএব সময় পাওয়া যাবে। প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যখন জানা গেল কোন দল কিডন্যাপ করেছে, কোন দিকে নিয়ে গেছে তখন শুক্রটা নিশ্চয়ই মশ হয়নি।

টাইবাল ন্যাশন্যাল ভলেন্টিয়ারের নেতা বিজয় রামবেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। ত্রিপুরার মানুষের অধিকার আদায় করতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ত্রুটি করেছিলেন ভদ্রলোক। সংঘাত বেধেছিল, দাঙ্গাও হয়েছিল কিন্তু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শেষপর্যন্ত তাদের পৃথক মেলা পরিষদ গঠন করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এটাই তখন অনেকখানি মনে হলোও পরবর্তী পর্যায়ে নতুন দল ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা ঘোষণা করল শিশুর হাতে মোহা ধরিয়ে দেওয়া তারা মানবে না। তাদের হ্রোগান হল বাঙালি খেদাও, স্বাধীন ত্রিপুরা চাই। লক্ষ করা গেল এই দলের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রসাদ জামাতিয়া এবং নন্দনবাসি জামাতিয়া ছাড়া সবাই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। ব্যাপটিস্ট চার্চের সঙ্গে তাদের সংযোগ আছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে খ্রিষ্টিয়ানের প্রভাবে আসা খ্রিস্টান মিশনারিরা যে ধর্মপ্রচারে নেমেছিল তাদের কাজের জারগা প্রশস্ত ছিল আদিবাসী অঞ্চল এবং পাহাড়ের মানুষদের মধ্যে। ত্রিপুরার আদিবাসীর মূলত হিন্দু এবং দরিদ্র। দেশের সম্ভ্রান্তরা স্বপ্ন দেখিয়ে ধর্মপ্রচার করতে যেতেন অসুবিধে হচ্ছিল বাঙালি মেলাও আন্দোলন সেটা কিংবা দূর করল। বাঙালিরা হিন্দু। সুবিধেভোগী খাত। তারা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে তোমানের মুকের ওপর চেপে বসেছে। তোমানের নিজের জায়গায় প্রায় পঁচাব্ব্ব্বি হয়ে আছে এখন। এদের হঠাতে গেলে এদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। হিন্দু হয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। তোমরা খ্রিস্টান হও, নিজেরা মাটি নিজে ভেঙে দেবে। কিছুটা সাড়া পাওয়া যেে যাবনি তা নয় কিন্তু সব মানুষ চট করে ধর্ম ছাড়তে পারছিল না। অভ্যাস অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এন এল এফের নেতারা যখন আত্মগোপন করলেন তখন তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন। বিশ্বমোহন দেববর্মী হলেন ডি বাইশন, যোগেন্দ্র দেববর্মী হলেন মোগুয়া, এমনকী বিষ্ণুপ্রসাদ জামাতিয়া হলেন খ্রীষ্টান ছিলেন না, দলের অর্ধাঙ্গদের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তিনিও নিজেকে জে বসং বলে ঘোষণা করলেন। খ্রিস্টানদের এই প্রাবল্য এবং চার্চের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে বৈকল্প নন্দনবাসি জামাতিয়া দল ছেড়ে বেরিয়ে যান। ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট প্রকাশ্যে স্বীকার করছে না কিন্তু ত্রিপুরার খ্রিস্টধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেলে হিন্দু বাঙালিরা বিপদ বোধ করবে বলে তাদের যে দাঙ্গা একধা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এই ফ্রন্ট এখন অস্তিত্ব সুগঠিত কারণ দলের প্রথম সারির নেতাদের কল্যাণের প্রতিদিন সন্মুখ হচ্ছে। তাই হিন্দু হয়েও জে বসং এই দলের অন্যতম নেতা হয়ে থেকে গেছেন।

যেটা পারেননি নন্দনবাসি। পালাটা দল হিসেবে যখন অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স তৈরি হল তখন দেখা গেল এর নেতারা মূলত বৈকল্প। এদের ধর্মবিশ্বাস এত প্রবল যে নন্দাপান করাও অনায়াস তাদের। অথচ জামাতিয়া পদবির মানুষ এককালে ছিলেন রাজার সৈনিক। আর দেববর্মী পদবির মানুষের শরীরে রাজকল্ল রয়েছে। বিখ্যাত

সেববর্মা দলের সম্পাদক, কৃষ্ণকমল সেববর্মা অন্যতম নেতা। হিন্দুধর্মী এই দলটির বিভিন্ন নেতার নামেই সেটা প্রমাণিত হয়। যেমন, ক্ষেত্রজয়, কল্পজয়, বিজয়। এদের সঙ্গে আছেন রিয়াজ পানবির নেতারা যারা আদিম উপজাতি গোষ্ঠী থেকে এসেছেন। টাইগার ফোর্সেরও একই দাবি, স্বাধীন ত্রিপুরা চাই, বাঙালিদের খেদিয় দাও।

আর এই আক্রমণের মোকবিলা করতে ত্রিপুরার 'আমরা বাঙালি' দলটি একসময় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক অদর্শ নয়, শুধু বাঙালি আবেগ সঞ্চাল করে এরা ত্রিপুরার দ্বিতীয় শক্তিশালী দল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কয়েকসের পতনের পর সি পি এমের ক্ষমতা দখল করার পাশাপাশি 'আমরা বাঙালি' অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিল কিছুকাল। কিন্তু বাঙালির আবেগ সবসময় বৃদ্ধবৃদের মতো। স্বতঃতাত্কাহিত্য তা জেমে ওঠে ঠিক তত তাত্কাহিত্য মিলিয়েও বায়।

ত্রিপুরায় সি পি এম একটি অজুত চরিত্র নিয়ে ছড়িয়ে আছে। গ্রামগুলোতে বিশেষ করে পার্বত্য ত্রিপুরার গ্রাম পঞ্চায়েত সি পি এমের দখলে। কিন্তু সেইসব পঞ্চায়েত নেতা গলিট্যুরারো খবর দুয়ের কথা হার্কসের নাম জানেন না। আগরতলার নেতাদের নির্দেশ মান্য করতেই হবে এমন কোনও মানসিকতা তাঁদের নেই। এবং এই কারণেই টাইগার অথবা এল এলসের অস্বাভাবিক পার্বত্য এলাকায় সক্রিয় হয়। অনেকটা, তোমরা তোমাদের মতো থাকো আমরা আমাদের মতো লুটপুটে খাই, এইরকম ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

বাসুদেব খির করণ, যে করেই হোক টাইগারের সম্পাদক বিশ্বজিত সেববর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এই একটি লোক পারে সৌমিত্রকে মুক্তি দিতে। কিন্তু তার গোপন আন্তার্যার খবর ত্রিপুরার পুলিশের জানা নেই। পাছাত্তের কোন খাঁজ, ছত্রসেলের কোন গভীরে থেকে সে দসকে চালাচ্ছে তা সরকারি গোয়েন্দারা আন্দাজ করতেও পারে না। অবশ্য এখন দল চালায়না তাই কিনয়াদাপ করে টাকা রোজগার করা। এর চেয়ে সহজ উপায় তো আর কিছু নেই। অলস অথবা বোরোদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে টাকা লাগবে। টাকা লাগে বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসতে।

টেলিফোন বাজল। এটা যদি তখন রিয়াজ হয় তা হলে ওকেই বলবে বিশ্বজিত সেববর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। ওদের অনেক খবর সারা পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছে সে, তার বললে এই দাবিটুকু মানতে হবে। রিসিভার তুলল সে, 'হ্যালো।'

পুলিশের এক বড়কর্তা শংকর দত্ত। শংকরবাবু বললেন, 'খবরটা শুনেছেন?'

'কেন খবর?'

'কী মশাই? এখনও শোনেনি। আমরা জো এখনই রায়বাড়ি রওনা হচ্ছি।'

'রায়বাড়ি? কেন?'

'সেখানে আজ বিকেলে গণধর্ষণ হয়েছে। করেছে এল এলসের লোকেরা।'

'সে কী? কতজন ছিল ওরা?' বাসুদেব সোজা হয়ে বলল।

'এখনও খবর পাইনি। তবে এগারোজন মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

৩৬

'আপনারা এই রাতে যাবেন?'

'হ্যাঁ, সি এম অর্ডার দিয়েছেন।'

'আমি সঙ্গে যেতে পারি?'

'আখণ্ডটার মধ্যে চলে আসুন।'

টেলিফোন ছেড়ে কম্পিউটারের সামনে বসল বাসুদেব। 'ত্রিপুরার সীমান্তগ্রাম রায়বাড়িতে গণধর্ষণ। এগারোজন মহিলাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের আঙুল এল এলসের দিকে। ঘটনারই থেকে ঘুরে এসে বিস্তারিত খবর পাঠাচ্ছে।' খবরটা টাইশ করে ই-মেইলে ওর বিদেশের টি ভি-নেতার কোম্পানির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নীলাকে ফোন করল সে। নীলাই ফোন ধরল, 'শোনো বাড়ির খবর কী?'

'মা অজান হয়ে গিয়েছিল কীভাবে কীভাবে। ভাঙলর এসেছিল।'

'ওদের কোনও ফোন এসেছে?'

'না।'

'আমি খবর পেয়েছি টাইগাররাই কাজটা করেছে। কিন্তু বাড়ির কাউকে খবরটা এখনই বলার দরকার নেই। আর আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।'

'কোথায়? এত রাতে কোথায় যাবে?'

'প্রায় চিৎকার করে উঠল নীলা।
'ভয়ের কিছু নেই। পুলিশের একটা বিপাল বাহিনী বাচ্ছে রায়বাড়িতে। ওখানে গণধর্ষণ হয়েছে, খবর অন্তত যাচ্ছি। কোনও দরকার পড়লে মোবাইলে ফোন করবে।' রেখে দিল বাসুদেব।

গ্রামটাকে ঘিরে ফেলেছিল পুলিশ। রাত তখন দুটো। অফিসারদের সঙ্গে ভিপি থেকে নেমে গ্রামে ঢুকল বাসুদেব। শ'দেড়েক মানুষ ওই গ্রামে বাস করে। তারা এখন যে যার ঘরে। ককেকজন মাতবর হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি থানা গ্রাম তিরিশ মাইল তফাতে। তার দুরোগ্য বড়কর্তাদের স্যাণ্টু দিলেন। প্রধান কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথার ঘটনাটা ঘটেছিল।'

দুরোগ্য একজন মাতবরকে ডাকলেন, 'আই, এমিকে আয়ে। বল কোথায় হয়েছে।'

সামনের ফাঁকা জমিটাকে দেখিয়ে দিল লোকটা। বড়কর্তাদের আসবার আগাম খবর পেয়েই সত্তবত মণ্ডাল এবং হাজারক জালিয়ে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন দুরোগ্য।

'কী হয়েছে খুলে বলুন।'

লোকটি যে বাংলা বলল তা ব্রীহট্ট জেলার ভাষা। প্রথমেই সে জানাল, তাদের গ্রামের মানুষ কোনও রাজনীতিতে থাকে না। বাস্তবায়ন হয়ে এখানে এসে বেঁচে থাকার জন্যে পরিগ্রহ করতেই দিন চলে যায়। আজ বিকেল চারটে নাগাদ হঠাৎই কুড়িজন লোক গ্রামে ঢোকে। ওদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল বা বন্দুক ছিল। ওরা আমাদের কাছে সাহায্য চায়। বলে বি এস এলসের লোকজন খুব আফেলা করছে। তার ফলে ওরা বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশে যেতে সম্ভাব্য পড়ছে। আমরা যদি ওদের

হয়ে বাংলাদেশে যাওয়া আসা করি তা হলে বি এস এক তেমন কিছু বলবে না।
ওদের জন্যে মালপত্র এনে দিতে হবে এবং পৌঁছাতে হবে। তার জন্যে ওরা
আমাদের টাকা দেবে। কিন্তু আমরা রাজি হলাম না। বললাম, ইন্ডিয়া সরকার
আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। আমরা এমন কোনও কাজ করতে পারি না যাকে বেইমানি
বলে। বেইমানি করলে ইন্ডিয়া সরকার আমাদের কমা করবে না। ওরা এসব কথা
শুনতে চাইছিল না। খুব রেগে গেল, আমাদের শাসাতে লাগল। বলল, কথা না
শুনলে গ্রাম ছাড়িয়ে দেবে। ওই ওকে রাইফেল দিয়ে মেরে শুইয়ে দিল। যে
লোকটাকে দেখানো হল তার মুখচোখ বেশ ফুলে গেছে। লোকটি বলতে লাগল, 'ওকে
মারছে দেখে ওর মেয়ে ছুটে এসেছিল ব্যাকে বাঁচাতে। তাকে ধরে ফেলে উলঙ্গ করল
ওরা। তারপর গ্রামের সব লোককে লাইন দিয়ে দাঁড় করাল। ভয় দেখাবার জন্যে শূন্যে
গুলি ছুড়ল একবার। আমাদের মোসদের মধ্যে থেকে দশজনকে বেছে নিয়ে মারধর
করে ওই মেয়েটার পাশে উলঙ্গ করে দাঁড় করাল। তারপর একের পর এক ওরা ইচ্ছা
নষ্ট করল। আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে থাকল বাকিরা।

প্রধান কথী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটা বাধা দেতনি?'

লোকটি জানাল মেয়েটা বাধা দিতেই ওরা আরও নিষ্ঠুর হয়ে গেল। মেয়েটা
যাতে কষ্ট পায় তাই উপভুক্ত করে ধর্য করল ওরা। এক একজন করে থেকে
তিন-চারজন। তারপর চলে যাওয়ার আগে উপভুক্ত হয়ে পড়ে থাকা মেয়েগুলোর পিঠে
ছুরি দিয়ে কাটাছুটি করে রক্ত বের করে ঘোষণা করল, 'আজ থেকে এদের আর
কোনও ভয় নেই, এরা খ্রিস্টান হয়ে গেলা।'

শংকর দত্ত চাপা গলায় বললেন, 'মাই গড!'

বাসুদেব এর আগে ধর্মগুরু কেস দেখেছেন। কিন্তু পিঠে ছুরি দিয়ে কাটাছুটির কথা
শোনেনি। এখন এখানে এমন পরিস্থিতি যে এ ব্যাপারে বিশেষ প্রশ্ন করতেও খারাপ
লাগছে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই হাসপাতালে গেলে জানা যাবে। সে শংকর দত্তকে
জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা হাসপাতালে যাবেন না?'

'এত রাতে গিয়ে তো কথা বলা যাবে না। আক্রান্তরা নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছে।' শংকর দত্ত
বললেন।

'কিন্তু মানবিকতার কারণে আপনারদের যাওয়া উচিত। অন্তত ডাক্তারদের সঙ্গে
কথা বলে ওদের অবস্থা জেনে নিতে পারবেন।' বাসুদেব পরামর্শ দিল।

শংকর দত্ত তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন। চিকিৎসা অর্ধেক দল
আত্মসমত্যাগ ফিরে যাবে, শংকর দত্ত এবং কয়েকজন হাসপাতালে যাবেন
ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে। প্রধান কথী এরপরে গ্রামের মানুষদের কিছু প্রশ্ন
করলেন। আক্রমণকারীদের কাউকে তারা চিনতে পেরেছে কি না? তারা কী ভাষায়
কথা বলছিল? উত্তর হল, ওদের কেউ কখনও দেখেনি। আর কথা বলছিল
আধিবাসীদের ভাষায়। যে ভাষায় পার্বত্য উপজাতিরা কথা বলে। কিন্তু তার সঙ্গে
বাংলা শব্দও ব্যবহার করছিল।

ওই গ্রামে একটা পুলিশ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে প্রধান কর্তাদের কয়েকজন ফিরে
গেলেন আগরতলায়। এখনই সি এমকে রিপোর্ট দিতে হবে। বাসুদেব হাসল। সি এম

দুখ থেকে উঠে সকাল আটটার হইতো রিপোর্টিং শেষবেন। তারপর রিপোর্টার
ডেকে জোরালো বিবৃতি দেবেন। বিধানসভা খোলা থাকলে ছালামহী ভাষণ দেবেন।
প্রতিক্রিয়া দেন এই ভঙ্গি বর্বরতা আর বরলাভ করবেন না। কিন্তু কাজের কাজ এক
বিশুণ্ড হবে না।

হাসপাতালে পৌঁছাতে ভোর চারটে বাজল। বাইরে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।
ভিউটিতে থাকা ডাক্তার শংকর দত্তকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শংকর দত্ত
জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটা কেমন আছে?'

ডাক্তার বললেন, 'দুশ্বনের অবস্থা বেশ খারাপ। ভেতরে হেমারেজ হইয়াছে।
বাকিরাও দিন পাঁচেকের মধ্যে ইটিচলা করতে পারবে না।'

'ঘুমাচ্ছে?'

'ঘুমের শুধু সেওয়া হইয়েছে বলে ঘুমাচ্ছে। তবে শরীরের থেকে আসল সমস্যা
হল মনের। প্রত্যেকেরই নার্ভাস ব্রেক ডাউন হইয়েছে।' ডাক্তার কাদলেন।

বাসুদেব চুপচাপ শুনছিল। এবার প্রশ্ন করল, 'ডাক্তার, ওদের গ্রামে গিয়ে শুনেছি,
যে রোগ করার পর নাকি প্রত্যেকের পিঠে ছুরি দিয়ে কিছু করা হইয়েছে। এটা কি
সত্যি?'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, কায়ও কারও পিঠে ডিপ ক্ষত হইয়েছে।'

'কী দিচ্ছে ওরা?'

'আনুন, দেখবেন। আমি কথটা বলতে চাই না।'

ডাক্তারকে অনুসরণ করে ওরা ওয়ার্ডে এল। বেডের অভাবে একটিতেই
দুজনকে রাখা হইয়েছে। প্রত্যেকের শরীর গলা পর্যন্ত চাপরে ঢাকা। কেউ জেগে
নেই। নার্ভ উর্ডে পঁড়তে ডাক্তার বললেন, 'একজনের পিঠ থেকে কাপড়টা সামান্য
সরিয়ে দিন জো।'

যে মেয়েটি ওদের দিকে পেছন ফিরে শুয়েছিল তার পিঠ থেকে স্তব্ধভাবে কাপড়
সরিয়ে নিতেই চমকে উঠল বাসুদেব। শংকর দত্ত বললেন, 'সাংঘাতিক!'

নার্স আবার কাপড়টি ছিক করে দিতে ওরা বেরিয়ে এল। বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল,
'এটা আপনি বলতে চাননি কেন?'

'এই অঞ্চলে আমি একমাত্র আগরতলার বাঙালি। ডাক্তার হিসেবে কাজ করছি
বলে রেহাই পাচ্ছি। তবে সুনতে শেলাম ওরা ডাক্তারদেরও ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই
মেয়েদের এখানে নিয়ে আসার পরেই ফোন এসেছিল। আমাকে শাসনো হইয়েছে
কেন কাউকে নিজের মুখে ওই ক্ষতের কথা না বলি। তাই আপনারদের আমি বলিনি,
আপনারা দেখেছেন।' ডাক্তার উদ্ভব দিলেন।

শংকর দত্ত বললেন, 'এখন যথ্যতে পারছি কেন ওরা ঘোষণা করেছিল আজ
থেকে মেয়েগুলো খ্রিস্টান হয়ে গেলা।'

যন্ত্রণাদায়ক কাজ করেও ওরা মাথা ঠান্ডা রেখে প্রত্যেকটি মেয়ের পিঠে ক্রশ চিহ্ন
ছুরি দিয়ে একে গেছে। বিশুদ্ধভাবে যখন ক্রশবিশিষ্ট করা হইয়েছিল তখন তিনি প্রশ্নও
যন্ত্রণা পাওয়া সত্ত্বেও স্বরকে অনুরোধ করেছিলেন আক্রমণকারীদের কমা করে
দিতে। আজ বিকেলে যখন তাঁর শুধাকথিত প্রচারকরা মেয়েগুলোর পিঠে ক্রশ চিহ্ন

আঁকছিল তখন নিশ্চয়ই তিনি বস্ত্রাচার কঁকড়ে উঠেছিলেন। এত কষ্ট হরতো তখনও পাননি। এখনও কি তিনি কন্মাত্রার্থনা করবেন এদের জন্যে?

চিঠিটা লিখে দেওয়ার পর হাল ছেড়ে দিয়েছিল সৌমিত্র। কোনও পেশেন্ট তার অশেষকতে নেই, ওরা তাকে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ এবং গোপন ডেরার রাখার জন্যে। এদের নিশ্চয়ই গাড়ির অভাব নেই কিন্তু গাড়ি ব্যবহার করার কুঁকি ওরা নিচ্ছে না। গাড়ির রাস্তায় ঘন ঘন পুলিশ পাহারার আসে। আছে প্যারা-মিলিটারি অথবা বি এস এফের লোকজন। সৌমিত্র অবিকার করল, হাল ছেড়ে দেওয়ার পর তার আর খুশ আসছে না। চাঁচিহয়ের ওপর শুয়ে সে অন্ধকার জঙ্গলের অস্বস্তি সব আওরাজ্ঞ সনতে পাচ্ছিল। অঞ্চল সমস্ত শরীরে তীব্র যন্ত্রণা রয়েছে, দুটো পা ক্ষতবিক্ষত, হাঁটুর ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত হাসলগুলো লক্ষ হয়ে গিয়েছে। জীবনে এত দৌড় কখনও সৌমিত্রিনি।

একটা ব্যাপার সে এখানেও লক্ষ করেছে। যে বাড়ি থেকে রাস্তার রাখার আসছে ওরা আছে তার ঠিক পেশেন্ট। অঞ্চল বাড়ির কোনও মানুষ কোঁতুহলী হয়েছে তাদের ঘেঁষতে আসছে না। হয় ওরা ভয়ে আসছে না নয়তো ওদেরও কোঁতুহলী না হওয়ার টেনিং দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য, সে যদি এখন থেকে আর না যেতে চায়? যদি এভাবেই শুয়ে থাকে? ওরা তো তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারবে না! ওরা নিশ্চয়ই তাকে মাথায় তুলে নিয়ে হাটবে না। সে যেতে না চাইলে ওরা কী করতে পারে? আরবে? মারক, এখন তার কিছুই এসে যায় না। মেরে তো ফেলবে না! টাকার জন্যে ওকে ওরা বাঁচিয়ে রাখবেই।

চিঠিটা পৌঁছে গেলে বাড়িতে যে প্রতিক্রিয়া হবে তা সে আন্দাজ করতে পারে। শিকড়ের যতই পুলিশে চাকরি করুন না কেন নিজের স্ত্রীর আশেপাশে শেষপর্যন্ত মেনে নেন সবসময়। অতএব মল্লের কামার কাকে আশ্বাসমণ্ডল করে ঢাকা জোগাড় করতে বেরে হবেন। গুঁর বউমারও সমর্থন থাকবে টাকার বিনিময়ে স্বাধিকার ফিরে পেতে। যদি সেটা সম্ভব হয় তা হলে কী নিরাট অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে তা সে কল্পনা করতে পারছিল না। বাসুদেবের কথা মনে পড়ল তার। বাসুদেবও কি টাকা দেওয়ার ব্যাপারটাকে সমর্থন করবে? এখানে যদি সে মরে যায় তা হলে পুরো পরিবার বেঁচে যাবে। পঁচিশ লাখ টাকার ব্যবস্থা তো করতেই হবে না বরং বিমা কোম্পানি থেকে বেশ ভাল টাকা পেয়ে যাবে ওরা। এমন তো হতে পারত, আগরতলার রাস্তায় দুর্ঘটনার অথবা বাড়িতে বসে ম্যাসিভ হাট অ্যাটাকে সে মারা গিয়েছে। তখন তো সত্যিটাকে ওরা মেনে নিতে বাধ্য হত।

হট হট। একজন প্রহরী চিংকার করে উঠতেই জঙ্গলের ভেতর কেনও অজুত প্যালানোর শব্দ হল। সৌমিত্র উঠে বসল, 'কী ভাই, এই জঙ্গলে বাঘ আছে নাকি?' ওরা কেউ কোনও কথা বলল না। সৌমিত্র হাসল, বাঘ হলে ছাগল ভাড়াবার শব্দে ছুটে পালাত না। আশ্চর্য, এরা পঁচিশ লাখের বদলে যদি এক কোটি টাকা চাইত তা হলে নিশ্চয়ই শি বি ছেলের আশা ছেড়ে দিতেন।

রাত তিনটের সময় ছেলোটী চট হাতে ফিরে এসে বলল, 'চলুন।'

'কোথায়?'

'পেশেন্ট আছে।' নিম্পূহ গলায় জবাব দিল ছেলোটী।

'যেখট মিথ্যে কথা বলছেন, আর কেন? আপনারা আমাকে তুলে এনেছেন টাকার জন্যে, আমি চিঠিও লিখে দিয়েছি তবু পেশেন্ট আছে বলার কী দরকার?' সৌমিত্র চিংকার করল।

'আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে আমি তাই বলছি ডাক্তার। উঠুন।'

'না। আমি কোথায় যাব না, এখানেই শুয়ে থাকব।'

'তা হলে তো আমাদের নেতার সঙ্গে আপনার আলোচনা করা হবে না।'

'নেতা? কে নেতা?'

'সেটা দিয়েই জানতে পারবেন।' এখানে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'কেন?'

'সিকিউরিটির সমস্যা আছে।'

শব্দ করে হেসে উঠল সৌমিত্র, 'সিকিউরিটির প্রশ্ন! তোমরা এখন ত্রিপুরাতে রাজত্ব করছ, তোমাদের কথাই যখন শেষ কথা তখন তোমরা কাকে ভয় পাছ হে?'

'আপনার কী হয়েছে?'

'মানে?'

'হঠাৎ বাঘ কথা বলছেন। শুনুন, এখানে যদি শুয়ে থাকেন তা হলে সমস্যা যেমন আছে তেমনই থাকবে। আর যদি নেতার সঙ্গে কথা বলেন তা হলে সেটা অনেক সহজ হতে পারে।'

সৌমিত্রর মনে হল ছেলোটীর বচন কম হলেও বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছে। টাকা যদি দিতেই হয় তা হলে নেতার সঙ্গে দরাসরি করে যতটা কমানো যায় ততটাই লাভ হবে। সে উঠল।

এদিকের জঙ্গল আরও গভীর এবং সে কারণেই অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওদের হাতে টর্চ আছে কিন্তু সবসময় জ্বালছে না। হাঁটার ভরিতে বোকা যাচ্ছিল পথ ওদের চেনা। কিন্তু ভাল রাখতে পারছিল না সৌমিত্র। যদিও এখন তারা সৌভাগ্যে না কিছু ভ্রত হাঁটার জন্যে তার শরীর গাছগাছালির সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিল প্রায়শই। দুটো পা যেন লোহার মতো ভারী হয়ে গেছে। সে একসময় মাড়িয়ে পড়ল। ছেলোটী ফিরে এল তার কাছে, 'কী হল? হুটুন।'

'আর পারছি না। পা চান্নাছে না।'

'চেষ্টা করুন। আর এক ঘণ্টা। ভোরের আগে এই জায়গাটা পেরিয়ে যেতে চাই।'

'কেন? এখানে কী আছে?'

'পাশেই একটা বাঙালি হিন্দুদের গ্রাম আছে।'

'ওরা এখনও এখানে আছে?'

'হ্যাঁ। ওই গ্রামেই অর্মির ক্যাম্প।'

'এখানে মাড়িয়ে চিংকার করলে ওরা সনতে পাবে?'

'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন। ওরকম কিছু করলেই আপনাকে মেরে ফেলার আশঙ্কা আছে।'

‘কিন্তু ভাই, বিশ্বাস করো, আমার শরীরে একফোঁটাও শক্তি নেই।’

‘টিক আছে, আস্তে হুঁদে। কিছু কেনও চালাকির চেষ্টা করবেন না।’

কোথাও কেনও আলো নেই। এই জায়গাটা ভারতবর্ষ না হয়ে আফ্রিকা হলেও কেনও ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। ওরা হাটা শুরু করল। কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ সামনের লোকটি দাড়িয়ে পড়ল। টর্চের আলো দেখানে পড়ল সেখানে লেকের ওপর ভর করে দাড়িয়ে আছে কুচকুচে কাগো একটি সাপ। বেশ মোটা, বুক উচু উচ্চতার দুলতে দুলতে সাপটি জিত বের করে মুখের ভেতরে টেনে নিল।

সামনের লোকটি বন্ধু উঠিয়ে ধরতেই ছোঁটটি চাপা গলায় অদিবাসী ভাষায় কিছু বলতেই লোকটি সেটা নামিয়ে নিল। সৌমিত্র দেখল ছেলটি কেমর থেকে একটা ছোট ছুরি বের করে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ছুড়তেই সেটা সাপের ফ্যার নীচে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খুব গুবড় পড়ল সাপটি, পড়ে লেজ দিয়ে খোশের ওপর আঘাত করতে লাগল।

ওটাকে মেরে ফেলতে এরা বেরি করল না। ছুরিটা সাপের শরীর থেকে খুলে নিয়ে গাছের পাতা ছিড়ে মুছল ছেলটি। তারপর বলল, ‘চলুন।’ যেন কিছুই হয়নি, কেনও ঘটনাই ঘটেনি।

মৃত্যু এত কাছে ওত পেতেছিল, আর কয়েক পা এগোলেই প্রথম লোকটি ছোবল খেত, কিন্তু এই ছেলটি অথবা লোকগুলো যে সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর তা বুঝতে সময় লাগল না। একটুও উদ্বেজিত হয়নি এরা, সাপটিকে মারার পর কেনও উল্লাস দেখায়নি। এদের সংখ্যা যত বেড়ে যাবে তত ভারতবর্ষের মানচিত্র বিপন্ন হবে। এরা এখন পুলিশ বা মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষে যাচ্ছে না, শুধু অর্ধ সন্ধ্যা করে চলেছে। আর সেটা করার সময় এদের রক্ত সাপের চেয়েও ঠাণ্ডা থাকছে।

একসময় ভোর হল। আকাশ দ্রুত পরিষ্কার হয়ে আসছে। সাপের ঘটনাটির পর সৌমিত্র আবিষ্কার করল তার শরীরের যন্ত্রণা এখন আর তেমন তীব্র নয়। অন্তত আরও এক ঘণ্টা সে হেঁটে এসেছে কেনও কিছু টের না পেয়ে। মনের চাপ তা হলে এভাবেই শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এদিকের জঙ্গলটা বেশ ফাঁকা। ছেলটি বলল, ‘এখন কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম নিতে পারেন।’

‘কেন?’ সৌমিত্র প্রশ্নের কথায় অবাক হল।

‘সামনেই হাইওয়ে। প্রায়ই আমিরা গাড়ি যায়। একেবারে নিশ্চিন্ত না হয়ে আমরা রাস্তা পার হব না।’ সে দুজন লোককে নির্দেশ দিতেই তারা রওনা হল।

সামনেই যদি হাইওয়ে হয় তা হলে গাড়ি এলে শব্দ পাওয়া যাবে। সেই শব্দ পেলেই যদি সে দৌড়োতে শুরু করে তা হলে আমিরা লোকজন নিশ্চয়ই তাকে গুলি করবে না। ওদের কাছে পৌঁছে গেলে সে নিরাপদে আগরতলায় ফিরে যেতে পারবে। ভাবনাটা সৌমিত্রকে উত্তেজিত করল।

‘কী ভাবছেন?’ ছেলটি জিজ্ঞাসা করল।

‘আমি তো কিছু ভাবছি না।’

‘গুড। পালাবার চেষ্টা করবেন না। দেখেছেন তো, আমার ছুরির হাত খুব খারাপ

নয়। আমাকে ওটা ছুড়তে বাধ্য করবেন না।’ ছেলটি বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাটা মাথা থেকে বেরিয়ে গেল। চোখের সামনে সাপটাকে ছুরিবিদ্ধ হয়ে আছড়াতে দেখেছে সে। সাপের শরীর যত মোটা হোক তার শরীরের কাছে কিছু নয়।

‘আমরা আর কত দূর যাব?’

‘চিন্তা কেন? পথ তো একসময় শেষ হবেই।’

‘আমরা যদি কোথায়?’

‘পেপেট আছে।’

‘হুত?’ শব্দ করে বিরক্তি প্রকাশ করল সৌমিত্র।

লোকদুজন ফিরে এল। ওরা যা বলল তা আদর্শে বুল সৌমিত্র। কাছাকাছি কোনও বাড়িঘর নেই বলে জল পাওয়া গেল না। আর হাইওয়ে এখন ফাঁকা।

‘জল শুনে তেঁটা পেয়ে গেল সৌমিত্র। বলল, ‘জল খাব।’

‘পেলেই খাওয়া।’

সৌমিত্র দেখল ছেলটি একজন গ্রহীর ব্যাগ থেকে ব্যাভেজ বের করল। তারপর বলল, ‘চোখ বন্ধ করুন। এখন থেকে আপনি কিছুই দেখবেন না। ওখানে পৌঁছে চোখ খোলা হবে।’

‘কেন? আমি তো কিছুই চিনি না।’ সৌমিত্র প্রতিবাদ করল।

‘চিনতে কতক্ষণ?’ ছেলটি ওর চোখ ব্যাভেজে মুড়ে দিল।

কয়েক পা হেঁটে চলার পর আচমকা দৌড় শুরু হল। ওরা হাত ধরে থাকায় সব শক্তি দিয়ে ছুটতে বাধ্য হচ্ছে সে। ছেলটি সামনে বলে চলেছে, ‘কুইক, কুইক।’ বোধহয় রাস্তা পেরিয়ে আবার জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার পর ওরা থামল। এবার ধীরে ধীরে পথ হাটা।

আধ ঘণ্টােক পরে ছেলটি গ্রহীরদের কাউকে বলল জল নিয়ে আসতে। সে চলে যেতে সৌমিত্র বসতে চাইল। আপত্তি করল ছেলটি, ‘এখন বসলে আর আপনি হাটতে পারবেন না।’

‘আর কতক্ষণ হাটতে হবে? আমি আর পারছি না।’ সৌমিত্র হাঁপাচ্ছিল।

‘এই তো, বেশি দূর নয়।’

‘আমাকে তোমারা কেন নিয়ে যাচ্ছে?’

‘পেপেট আছে।’

শব্দটো শোনামাত্র সব প্রশ্ন গিলে ফেলল সৌমিত্র।

জল নিয়ে এল লোকটি। চোখ-বন্ধ অবস্থায় যতটা সম্ভব খেয়ে নিল সৌমিত্র। খাওয়ার পর সে কথটা ‘ভাবতেই হাসি পেল। ছেলটি জিজ্ঞাসা করল, ‘হাসছেন কেন?’

‘এ কোথাকার জল?’

‘পুকুর কিংবা কুয়ার, কেন?’

‘আগরতলায় তো ঘটেই বুঝাচ্ছেও আমি ফোঁটানো জল খেতাম। পুকুর তো দুদের কথা, আজকাল কুয়ার জল সরাসরি খাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারি না।

অথচ এই জল খেয়ে কী আরাম হল।'

হেলেটি কোনও মন্তব্য করল না। আবার পথ চলা শুরু হল।

আগরতলায় ফিরতে ভোর হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই রিপোর্টা টাইপ করে ই-মেইলে পাঠিয়ে দিল সে। অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই এই খবর সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল না, এই ভুলটা তার আঁকবাঁক হইল না, আঁজ হল।

খবরটা পাঠানোর মিনিট পাঁচেক বাসেই অনুরোধটা এল। ছবি চাই। অন্তত মেয়েগুলোর পিঠের ছবি। যত ভাড়াভাড়া সস্তর পাঠাও।

গিডি খবর ছবি ছাড়াই প্রচার করলে তেমন গুরুত্ব পাবে না এটা বাসুদেব জানে। সে শংকর দত্তকে ফোন করল। ভদ্রলোক বোধহয় বিছানায় শরীর এলিয়েছিলেন। বাসুদেব বলল, 'আপনার কাছে একটা সাহায্য চাই। এটা একেবারেই ব্যক্তিগত।'

'বলুন।'

'আমাকে একবার ওই হাসপাতালে যেতে হবে। একটু যদি আপনার লোকদের অ্যাপার্ট করে দেন।'

'কেন যাবেন?'

'আক্রান্তদের পিঠের ছবি তুলে আনা হয়নি। আমার হেডঅফিস চাইছে।'

'ও। হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে ক্যামেরা না দেখে অবাক হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আপনি খুব ডিস্টার্বড। অন্য দিনের মতো মুতে ছিলেন না।'

'থাকা সম্ভব নয়। কারণটা জ্ঞানতে চাইবেন না।' বাসুদেব বলল, 'তা হলে ওই কথা রইল।'

'দাঁকন। আপনার উচিত হবে না একা দিনের বেলায় গাড়ি চালিয়ে অত দূরে যাওয়া। আপনি বরং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার বাংলোর চলে আসুন।' শংকর দত্ত বললেন।

'আপনার বাংলোয়? কেন?'

'আরে মশাই, এক কাপ চা তৈরি খেয়ে যেতে পারেন।'

'আপনি সারারাত ঘুমাননি—।'

'তাতে আমরা অভ্যস্ত—। আসুন।'

পর্যটন মিনিট বাসে বাসুদেব যখন শংকরবাবুর বাংলোয় পৌঁছোল তখন রোদ বেশ তেজি হয়েছে। সন্ধ্যা সন্ধ্যা সেরেছেন ভদ্রলোক। বললেন, 'বসুন। চায়ের সঙ্গে নাস্তা চলবে?'

'অনেক ধন্যবাদ। শুধু চা।'

কাছের লোককে নির্দেশ দিয়ে শংকর দত্ত বললেন, 'আপনাকে অত দূরে কষ্ট করে যেতে হবে না। অবশ্য আমাদের পুলিশ-ক্যামেরাম্যানের তোলা ছবি আপনার পছন্দ হবে না কিন্তু কাজ যদি চলে যায় তা হলে দেখতে পারেন। ওটা এখনই পেয়ে যাব।'

'আপনারা ছবি তুলিয়েছেন? বাসুদেব খুশি হল।

'হ্যাঁ। কিন্তু সেই ছবি আমি আপনাকে অফিসিয়ালি দিতে পারি না।'

'ওহেল, ঋণ রইল।'

'না। ঋণ রাখা আমি পছন্দ করি না। কখন কার কী হয়, ঋণ আর শোধ করা হবে না।'

'তা হলে?' বুঝতে পারল না বাসুদেব।

'ডি.আই.জি সাহেবের ডাক্তার ছেলেকে এন.এল.এফ. কিডন্যাপ করেছে অথচ তিনি ডায়েরি করেননি, পুলিশকে অ্যাকশন নিতে বলেননি, এ কথাটা ঠিক তো?'

'বোধহয় ঠিক।' মাথা নাড়ল বাসুদেব।

'বোধহয় কেন? আপনার কোনও সম্ভেদ আছে?'

'ডায়েরি করেছেন কি না জানি না। তবে কলকাতা থেকে ফিরে সরাসরি ওঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেছি আপনারদের কয়েকজন, যারা ওঁর ছুঁনিয়ার ছিলেন, তারা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছেন।'

'ঠিক। ডি.আই.জি সাহেব ওঁদের পরামর্শেই কি ডায়েরি করেননি?'

হেসে ফেলল বাসুদেব। এখন সে কিছুটা আশ্বস্ত করতে পারছে। সে বলল, 'প্রথম কথা, পি. বি. এখন আর ডি.আই.জি নন। দ্বিতীয়ত, আমার সামনে অফিসাররা ওঁকে ডায়েরি না করার জন্যে কোনও পরামর্শ দেননি। তৃতীয়ত, ওঁর ছেলেকে এন.এল.এফ. কিডন্যাপ করেনি।'

'মহি গড! এটা আপনি জানলেন কী করে?'

'রিপোর্টাররা কি সোর্স কখনও বলে।' বাসুদেব হাসল।

এইসময় একই সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে চা নিয়ে এল কাছের লোক, আর ইউনিফর্ম পরা একটি পোক বাইরের দরজায় স্যাঁতল করে দাঁড়াল। লোকটির হাতে বড় খাম।

শংকরবাবু মাথা নাড়তেই লোকটি এগিয়ে এসে খামটা দিল। শংকরবাবু বললেন, 'ঠিক আছে।' লোকটি চলে গেল। খামের ভেতর অনেকগুলো ছবি। গ্রামের ছবি। মাৎকরদের কয়েকজন। মেয়েগুলোর মুখ। শংকরবাবু দুটো ছবি বাসুদেবের দিকে এগিয়ে দিলেন। ছবি নিল বাসুদেব। হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা একটি মেয়ের পিঠের ছবি। সেখানে ক্রশ আঁকা কতটি জ্বলজ্বল করছে। সামান্য রক্ত গড়াচ্ছে।

শংকর দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু এটা যে বানানো ছবি নয়, অর্থাৎ এই ছবি ওই ভিত্তিম মেয়েদের কারও তা প্রমাণ করবেন কী করে?'

প্রমাণ করবার দায় আমার নয়। কেউ যদি এটাকে মিথ্যা বলতে চায় তাকে যেতে হবে মেয়েগুলোর কাছে। আর এই মুহুরে ছবিগুলো তো মেয়েগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করবে।' বাসুদেব ছবিতাকে টেবিলে রাখল।

শংকরবাবু বললেন, 'আমার বাড়িতে কম্পিউটার আছে। আপনি এখান থেকে মেইল করে দিন। আর একটা অনুরোধ, আপনার শ্যালকের কিডন্যাপের ব্যাপারটা রিপোর্ট করুন।'

'কেন?'

'যখন একজন প্রাক্তন ডি.আই.জি পুলিশের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না

তখন সাধারণ মানুষ কী করে ভরসা পাবে এই শ্রমটা জোলা দরকার।

‘কিন্তু এটা করলে ডাক্তারের জীবন বিপন্ন হতে পারে। ওরা হুমকি দিয়েছে যেন পুলিশকে না জানানো হয়। তা ছাড়া খবরটা আমি দিলে পারিবারিক শান্তির ব্যৱস্থাটা বাজাবে।’

‘কিন্তু শুধু এই কারণে আপনি একটা অন্যায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন?’

শংকর দত্ত চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন। বাসুদেব সোঁটা নিয়ে চুমুক দিল, ‘আপনার ক্ষেত্রে হলে কী করতেন?’

‘সেকথা এখন বললে বড় বড় শোনাবে। গতকাল আপনি যখন হাসপাতালে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন তখন আমার সহকর্মীদের অনেকেই সোঁটাকে অগ্রসরোক্তীয় ভেবেছিলেন। অর্থাৎ আমার মনে হয়েছিল আপনি ঠিক বলেছেন। শুধু কথা শুনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, মেয়েদের চোখে দেখে এসে তা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আমার ক্ষেত্রে হলে আমি আপোশ করতাম না। আসুন।’

চা শেষ করে শংকর দত্তের সঙ্গে কম্পিউটাররুমে ঢুকল বাসুদেব। ছবিটোর কপি পাইয়ে দিল তার কেন্দ্রীয় দপ্তরে। তারপর সেগুলো শংকর দত্তকে ফিরিয়ে দিয়ে অশেষ ধন্যবাদ জানাল।

শংকর দত্ত বললেন, ‘আপনার শ্যালককে ওরা নিয়ে গেছে। আমি ধরে নিচ্ছি ডি আই জি সাহেব ওঁর মুক্তিপণ জোগাড় করে ফেলবেন। এ-খাপারে আপনার ভূমিকা কী?’

‘আপনি যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত। মুক্তিপণ সেওয়া আমি সমর্থন করি না।’

‘আপনি নিশ্চিত টাইগারদের কাজ এটা?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনার সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করে না?’

‘প্রয়োজন হলে করে। গুপ্তের প্রেস যে দেখে সেই রিয়ার মাঝে মাঝে করে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাকে ওরা যোগাযোগ করার সুযোগ দেয়নি।’

‘ওদের সম্পাদককে চেনেন?’

‘একবার দেখেছিলাম, লোকটা এখন রিপূরায় আছে কিনা আমার সন্দেহ।’

বাড়ি ফিরে এসেই বিছানার চলে গেল বাসুদেব। আর চোখ বুলে রাখতে পারছিল না। ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। রিসিভার তুলতেই নীলার গলা শুনে সে গেল, ‘তুমি কখন ফিরেছ?’

‘ভোরবেলায়।’

‘অশুভ। ফিরে এসে একটা ফোন করতে পারনি। সারারাত আমি জেগে বসে আছি। সকালে যতবার ফোন করছি ততবার অ্যানসারিং মেশিনে ডোয়ার গলা শুনি। তুমি আমাকে কি পাগল করে দেবে?’ নীলার গলায় উত্তেজনা।

‘সরি। এত ঘুম পেয়েছিল যে—।’

‘তুমি ঘুমাচ্ছিলে?’

‘হ্যাঁ। কাল রাত্রে খুব টেনশন গেছে।’

‘আমার ফোন শুনেও পাতনি?’

‘না। এই পেলাম।’

‘তুমি ঠিক আছ তে?’

‘হ্যাঁ। হ্যাঁ। কটা ব্যাঞ্জে এখন?’

‘দুটো।’

‘এত বেলা হয়ে গেছে। ওখানে কোনও খবর আছে?’

‘হ্যাঁ। ওরা ফোন করেছিল। বাবা বলেছে অত টাকা জোগাড় করতে পারছে না।

কিন্তু ওরা কোনও কথা শুনেও চায়নি। বলেছে তিনদিনের মধ্যে ছ’দিন সময় দিচ্ছে। টাকাটা চাই।’

‘কোথেকে ফোন এল?’

‘এক টাকার ফোন ফেলে করা যায় এমন একটা ফোন থেকে।’

‘ঠিক আছে। রাখছি।’

‘তুমি কখন আসছ?’

‘সেবি। তুমি বরং চলে এসো।’

‘তোমার সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাড়িতে এই অবস্থা দেখেও কী করে আমি যেতে পারি। তুমিই কদিন এই বাড়িতে এসে থাকো।’

‘ইম্পসিবল। রাখছি।’ রিসিভার রেখে দিল বাসুদেব।

কাজের লোক রান্না করে রেখেছিল। স্নান সেরে খেতে বসে দেখল অজুত একটা তরকারি রেখেছে লোকটা। সেজ হওয়ার পর মশলা পড়ায় বস্তুরটিকে চিনতে পারছে না সে। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘এটা কী তরকারি?’

লোকটা দাঁত বের করে হাসল, ‘আলুর খোসা।’

হতভম্ব হয়ে গেল। রান্নার গুণে সে আলুর খোসা চিনতে পারেনি। এ বাড়িতে কেউ আলুর খোসাকে খাওয়ার কথা ভাবে না। নীলা থাকলে তো রেসে যেত। লোকটা বলল, ‘বাক্সার করা হয়নি। কাল আলু কুটবার সময় খোসাগুলোকে রেখে দিয়েছিলাম।’

খাওয়া শেষ করে শুকে বাজারের টাকা দিল বাসুদেব। তারপর নীলাকে ফোন করল, ‘আজ চমৎকার খাওয়া হল। ডিমের খোল আর আলুর খোসার তরকারি।’

‘কী! আলুর খোসা? ও ব্যাক্সার করেনি? আমি তো টাকা দিয়ে এসেছিলাম।’

‘শেষ হয়ে গিয়েছিল। বোধহয়, আমার কাছে চাওয়ার সুযোগ পায়নি।’

‘বলিহারি! অবশ্য খোসা না থাকলে আমরা আলু খেতে পারতাম না।’

‘ঠিক। এবার অরিজিনিয়াল ছেঁচে খোসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করো।’

‘তুমি করো। সেদিন বলছিলে না, রাম নয়, রামায়ণ দশরথ আর রারবেণ গল্প। রাখছি।’

রিসিভার নামিয়ে রেখে হাসল বাসুদেব। ঠিক কথা। দশরথ যদি কৈকেয়ীর মন পাওয়ার জন্যে ওইভাবে বর না দিতেন আর সে-কারণে রামচন্দ্রকে যদি অনবাসে না যেতে হত তা হলে কি রামায়ণ লেখা সম্ভব হত? ফলে দশরথের গুরুত্ব রামায়ণে অনেকটা।

দশরথের কথা ভাবতেই হঠাৎ কঁপে উঠল বাসুদেব। লোকটার নাম দশরথ না? সে ক্রুত কপিউটারের কাছে চলে এল। যোমটম টিপতে টিপতে ঠিক জায়গায় পৌঁছে জিনে চোখ রাখল। হ্যাঁ, এই তো, লোকটার নাম দশরথ সেববর্মা। এসবাই বাবার গ্রামের সি পি এমের পঞ্চায়েত প্রধান। এরা এখন সি পি এম যারা পলিটব্যুরোর নাম শোনেনি। এই গ্রামে পুলিশ রাতে ঢুকতে চায় না। বেশ উত্তেজিত হয়ে ম্যাপ বের করল সে। মাথার ভেতর ধীরে ধীরে একটা মতলব জন্ম নিচ্ছে। জঙ্গলের নিয়ম কাটা কুটে গেলে কাটা দিয়ে তা ফুলতে হয়। এই নিয়মটাকে কাজে লাগাবে নাকি? অন্য কোনও রাস্তা খনন সামনে নেই তখন চোখ করতে দেখা কী?

খানিকক্ষণ চূপচাপ শুয়ে রইল সে। প্রচণ্ড খুঁকি রয়েছে কাজটা। হিতে বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়। শব্দমশাই এখানে কিছুতেই রান্নি হবেন না। নীলা তো প্রবলভায়ে বাধা দেবে। প্রথমত, ওরা তাকেই মেরে ফেলতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই কাজের জন্যে সৌমিত্রকেও ওরা শেষ করতে পারে। কিন্তু আর কোনও রাস্তা নেই। সে যে সময় চেয়েছে শব্দমশাইয়ের কাছে তার দুটো দিন পার হয়ে যাচ্ছে।

বিকেলবেলায় বাসুদেব চলে এসে শব্দরথাকিত। পি বি বাসেফিলন বাইরের ঘরে। এই কদিনেই যে ওঁর চেহারা খড়ো কাকের মতো হয়ে গেছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। বাসুদেব ওঁর সামনে গিয়ে বসতেই তিনি বললেন, 'শুনহে?'

'হ্যাঁ। ওরা সময় বাড়িয়েছে।'

'জুনালম ওরা নাকি মাস বেপ করেছে।'

'ওরা নয়। ওদের অপেক্ষিট গ্রুপ।'

'আমার কাছে একই হল। এখন যে করেই হোক টাকাটা জোগাড় করতে হবে।'

'আপনি এখনই কিছু করবেন না। সারাঞ্জীবন সত্যতার সঙ্গে চাকরি করলেন, এখন যদি কাগজগুলো লেখে একজন প্রাক্তন ডি আই জি হয়েও আপনি পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না তা হলে কী প্রতিক্রিয়া হবে ভাবুন তো।' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'কিন্তু আমি কী করতে পারি, বলো?' পি বি অসহায় গলায় প্রশ্ন করলেন।

'অপনার রিভলভারটা আমাকে দিন।' হাত পাতল বাসুদেব।

সৌমিত্র খনন আর পারছে না তখন ওরা চোখ খুলে দিল। হাতস্থ হয়ে সে দেখল সূর্য মাথার ওপর থেকে সরছে আর পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাড়িটা। জঙ্গল শেষ, যেন হঠাৎই একটা থকমকে বাড়ি বসিয়ে দিয়ে গেল আলাদিনের মতো। বাড়িটা কাঠের কিন্তু বিশাল। পাঁচিলটা টিনের। ছাদটাও। ছেলোট বলল, 'এসে গেছেন।'

সৌমিত্র ভেবেছিল এর আগে যেমন হয়েছিল এবারও ওরা নিশ্চয়ই তাকে বাড়ির বাইরে চাটাই পেতে বসাবে। কিন্তু ছেলোট পাঁচিলের গায়ের দরজা খুলে ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে বলল, 'আপনি বারান্দায় বসতে পারেন।'

বারান্দা মাটি থেকে কিছুটা উঠতে এবং কাঠের। সৌমিত্র সেখানে বসতেই মনে হল শুয়ে পড়লে বেশি আরাম পাবে। আজ সকাল থেকে জল ছাড়া কিছুই পেটে

যায়নি এবং এখন নিজের শরীরটাকেই বোঝা বসে মনে হচ্ছিল। সে ওয়ে পড়ল। পড়তেই অজুত দ্রুততায় ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙল যখন তখন সঙ্গে নামছে। পাঁথের আওয়াজ হচ্ছে বাড়ির ভেতর থেকে। তার আশেপাশে কেউ নেই। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল সে। এবার তার খুব খিদে লাগছিল। ওরা লোথায় গেল? এভাবে তাকে রেখে যাওয়া মানে ওরা ধরেই নিয়েছে তার পালাবার ক্ষমতা নেই। এইসময় বাড়ির ভেতর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল। কুকুরটা ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। এবার সে জট্টটাকে দেখতে পেল। গলার বেল্টের সঙ্গে দড়ি ছিল, স্টোর অর্ধেক ছিড়ে বেরিয়ে এসেছে। সোজা বারান্দায় নীচে এসে সৌমিত্রকে লক্ষ্য করে গর্জন করতে লাগল সেটা। এতকিছু পর যদি তাকে কুকুর কামড়ায় তা হলে আর দেখতে হবে না। সৌমিত্র ঠিক করল সে যে ভরে পেয়েছে তা বুঝতে সেবে না। হাসি হাসি মুখ করে সে ডাকল, 'আম, আম তু ভু।' সে কোথায় পড়েছিল ভয় পেয়েছে বুঝতে পারলে কুকুর তার আফালন বাড়িয়ে দেখে।

তিন-চারবার ডাকতেই কুকুরটা যেন কেমন ঘাবড়ে গেল। সে আবার একটি এগোতেই আসুরে ভাবভঙ্গি করতে লাগল প্রবলভাবে লেজ নাড়তে নাড়তে। এইসময় ভেতর থেকে একটা নারীকি কিছু টেঁচিয়ে বলল। সম্ভবত কুকুরটাকে ডাকল। আর সেটা শোনামাত্র কুকুরটা দৌড়ে ফিরে গেল যেখান থেকে এসেছিল সেখানে।

এইসময় একটি খ্রীলোককে দেখতে পেল সৌমিত্র। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। খ্রীলোকটির হাতে একটা আলুমিনিয়ামের থালা। দু'খ যোমটম ঢাল হলেও সৌমিত্র বুঝতে পারল এর ব্যস পঞ্চাশের ওপর। দু'পা হাজায় ভর্তি। থালাটাকে সৌমিত্রের সামনে বসিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই ফিরে গেল খ্রীলোকটি।

সৌমিত্র দেখল জলের মধ্যে অনেকটা ভাত, একটা পেঁয়াজ আর লুগা এবং লুগা লুগা কিছু তরকারি আর দু'খ বেশ পান। সন্ডের এই সময় সে কখনও ভাত খায়নি। তারওপর এটি নিশ্চয়ই পান্ডাভাত আর চালগুলো নিশ্চয়ই বেশ মোটা ছিল। কিন্তু খিদেয় থালা তাকে দুয়ার ভাবতে দিল না। জল নেই, হাত খুঁয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই, সে মুঠোয় ভাত নিয়ে মুখে পুরল। ঠাণ্ডা ভাত। পেঁয়াজ আর লুগার গ্রাসটা মন্দ লাগল না। তরকারি বলে যা ভেবেছিল তা যে মাছ হাতে নিয়ে বুঝতে পারল। কিন্তু মুখের কাছে ধরতেই তীব্র গন্ধ নাকে ঢুকল। এ নিশ্চয়ই শুঁটকি মাছ। মাছ পড়ে গেলে যে গন্ধ তা এরকম নয়। অবশ্যে কখনও শুঁটকি মাছ খায়নি সৌমিত্র। আগরতলার অনেকাই খায় কিন্তু তাদের বাড়িতে চল নেই। মা একবার বলেছিল, রোজ যখন রান্না মাছ পাওয়া থাকে তখন শুঁটকি খেতে যাব কেননা দুধুখে? আজ নাক বন্ধ করে মুখে পুরল সে। খাল খাল হলেও খাদ মন্দ নয়। কিন্তু গন্ধটা যেন পেটের ভেতরে ঢুকে গেল। খাওয়া শেষ হতেই খ্রীলোকটি আবার বেরিয়ে এল। এবার তার হাতে কাচের বোতল। বোতলটি রেখে থালা নিয়ে চলে গেল। যোমটম প্রায় ঠোঁট অবধি বলে তার মুখ দেখতে গেল না সে। কাচের বোতলটি বহু ব্যবহারে শ্যাওলার রং ঘেঁষে। ওতে জল আছে। এদের বাড়িতে কি কুরো অথবা নলকুপ আছে? জলের রঙটাও স্বাভাবিক। এই জল সে আগরতলায় ডুলেও হুঁত না কিন্তু এখন হাত পূল।

তারপর সব বিধা ছেড়ে দুটোকে গিলে ফেলল। স্বামির বিন ভোরবেলায় আসামি যদি বলে আমি ফেটানো জল ছাড়া বাব না তা হলে বেরকম শোনারে এখন তার তো সেই অবস্থা। পেটখারাপ হতে পারে, খড়িসও হতে পারে। কিন্তু সেগুলো হওয়া পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখবে কিনা সম্ভব।

এইসময় সে প্রাকৃতিক চাপ অনুভব করল। এদের হাতে পড়ার পর জঙ্গলের রাস্তায় সে জলবিয়োগ করেছে বেশ কয়েকবার কিন্তু শরীর কোঠকাঠিনো আক্রান্ত হয়েছিল বোধহয়। নইলে একবারও কোনও চাপ অনুভব করেনি কেন। এখন সেটা করছে। সৌমিত্র চিৎকার করল, 'কেউ আছে? কেউ আছেন এখানে?'

এইসময় পাঁচিলের দরজায় একটি লোক এসে দাঁড়াল। এই লোকটি তার পাহাদারদের একজন। ও বাইরে কেন? সৌমিত্র বলল, 'আরে ভাই আমি ট্যাগেট যাব।'

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল, কিন্তু কুল বললে মনে হল না।

সৌমিত্র একটি সহজ করে বলল, 'যুক্ত হতে পারলে না? পারখানা— পারখানা—'

লোকটির মুখের ভাবের কোনও পরিবর্তন হল না।

তখন সে স্পোটে হাত বুড়িয়ে ইশারায় বোঝাতে চাইল। লোকটি হাসল। তারপর ইঙ্গিতে বেরিয়ে আসতে বলল। অবাক হয়ে গেটের বাইরে যেতেই লোকটা আঙুল তুলে দূরের জঙ্গল দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ সৌমিত্রকে কর্মটি জঙ্গলে গিয়ে সারতে হবে। মোতলে তখনও বেশ খানিকটা জল রয়েছে। সৌমিত্র আর না দাঁড়িয়ে সোজা চলে গেল জঙ্গলের ভেতরে। হালকা হওয়ার পর জল ব্যবহার করতে করতে তার মনে হল, আর পর্যন্ত কখনও একই জল সে এতভাবে ব্যবহার করেনি। কিন্তু ওকে যে লোকটা এখানে পাঠালে ও যদি এই সুযোগে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে পুলিশ বা মিলিটারির কাছে পৌঁছায়? ওরা কি এই ব্যাপারটা চিহ্ন করছে না? পেছনে শব্দবন আওয়াজ হতেই সে তাকাল। দু দুটো শব্দ পাঁচিলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যে মোটেই ভয় পাননি তা মুখ দেখে বোকা বাজে। সৌমিত্র মনে হল আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। অন্ধকার ঘন হচ্ছে। জঙ্গলে সাপ তো আছেই। সে রুত বেরিয়ে এল বাইরে। লোকটি তাকে ইশারা করল ভেতরে যেতে।

সৌমিত্র খুব রাগ হয়ে গেল। ওরা তাকে ধরে নিয়ে এসেছে। প্রথম দিকে মেরেছে, তারপর শৌভ করিয়েছে। সবসময় পাহারা দিয়েছে, পালালে বিপদ হবে বলে হুমকি দিয়েছে। কিন্তু ওসব যখন করছিল তখন নিজেই বেশ মূল্যবান বলে মনে হচ্ছিল। আমার দাম পাঁচিশ লক্ষ টাকা। ভি আই পি-দের যেমন বাড়িগার্ড থাকে আমারও আছে। আমার গুরুত্ব আছে বলেই আমাকে ওরা বন্দি করেছে। কিন্তু এখন মনে হল ওরা পাভাই দিচ্ছে না। পাহারা দেওয়া এটা দূরের কথা জঙ্গলেও যেতে বলছে। হঠাৎ নিজেই গুরুত্বহীন বলে মনে হচ্ছিল সৌমিত্র। সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আর সবার্ট কোথায়?'

অবজ্ঞা অন্ধকারে লোকটি জবাব না দিয়ে পকেট থেকে বিড়ি বের করে দেশলাই ছেলে ধরাল। রেগে গেল সৌমিত্র। বেশ কড়া গলায় হুকুম করল, 'আই, আমাকে একটা দাও।'

১৯৮৩/০৭/১২/১৮/১৯৮৩

তার বাড়ানো হাত দেখে লোকটা যুক্ত হতে পারল। দ্বিতীয় বিড়ি বের করে সৌমিত্র হাতে দিল। সৌমিত্র আশেপাশ করল, 'আঙুন।'

লোকটা দেশলাই দিল না, বিড়ি ধরিয়ে দিল। দিয়ে কোমরের রিডলভারে হাত রেখে ইশারায় বলল, ভেতরে যেতে। লোকটা তাঁর জন্যে রিডলভারে হাত রেখেছে বলে ভাল লাগল সৌমিত্র। সে ভেতরে বিড়িতে টান দিতেই কাশি এল। কাশিটা সামলাতে সামলাতে ভেতরে চলে এল। এখন অন্ধকার। বিড়িটাকে ফেলে দিয়ে সে আবার উঠে বসল বারান্দায়। আর তখনই মশার ঝাঁক ছুটে এল তার দিকে। অন্ধকারেও তাদের পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এই মশা কমড়ালেই কি ম্যালেরিয়া হবে? ম্যালিফ্যান্ট ম্যালেরিয়া? পেটে ভাত পড়ার পর শরীরটা একটু চাঙ্গা হয়েছিল। সৌমিত্র চিৎকার করতে লাগল আবার, 'এই যে ভাই, জলনি এসো।'

এবার লোকটি একা নয়, আর দুজন তার সঙ্গে পেট পেরিয়ে এল।

সৌমিত্র চিৎকার করল, 'এক মশা, এখানে থাকা যাচ্ছে না।'

অন্ধকারেও আকাশটাকে কালো দেখাচ্ছিল মশার জন্যে। ফেন ডেলা পাকিয়ে উড়ছে ওরা।

ওরা বারান্দার উঠে একটা ঘরের দরজা খুলে যা বলে হুকুম করল তার অর্ধ একটা হতে পারে। 'ভেতরে যাও।' সৌমিত্র রুত অন্ধকার ঘরে ঢুকল। ঘরের কোণে একটা হারিকেন ছিল। সেটা ছািলিয়ে মশার ধূপ ধরিয়ে দিল লোকটা। তারপর দরজা বন্ধ করে ওরা বেরিয়ে গেল। ঘরটি গরম কিন্তু মশামুক্ত। স্বস্তি পেল সৌমিত্র। এরমধ্যেই তার হাত এবং গলার কিছু জারগা ফুলে উঠেছে। যা হবার তা বোঝায় হয়ে গেল। ওরা তাকে প্রথম থেকেই এই ঘরে রাখতে পারত। ওকম স্বাধীনতার কী দরকার ছিল। তার মনে পড়ল, গত বছর চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিল কলকাতায় কাছে গিয়ে। সেখানে বাঘেরের রাখা হয়েছিল উন্মুক্ত আকাশের নীচে। ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পালিয়ে যেতে যাতে না পারে তাই চারপাশে বিশাল খাল কেটে পাঁচিল দেওয়া হয়েছিল। ঝুটি এলে বাঘেরের ভিজতে হয় যদি ভেতরের শুয়ায় যাওয়ার কথা তাদের না মনে পড়ে। ওদের চেয়ে বাঁচায় আটকে থাকা সিংহরা বরং বেশ ভাল আছে। বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না। তার নিজের অবস্থা ওই বাঘেরের মতো।

ঘরে কোনও আসবাব নেই। নিজের জামাপ্যাট এখন অসহ্য বলে মনে হচ্ছে। মরলা ঘামে ঝিটলল গন্ধ বের হচ্ছে এগুলো থেকে। পেগ্লিটাকে গায়ে রাখা যাচ্ছে না। শার্ট খুলে পেগ্লি বের করে নিয়ে এল শরীর থেকে। এনে আরাম পেল। পেগ্লিটাকে ছুড়ে ফেলে দিল এককোণে। তারপর আবার শাটটা পরে নিয়ে মেজের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

হারিকেনের আলোটা কীপছে। ওরা তাকে কি এখানেই রাখবে টাকা না পাওয়া পর্যন্ত? বোঝা যাচ্ছে না। সেটা করলে তবু স্বস্তি। আচ্ছা, ওদের কাছে পরিহার জামাপ্যাট চাইলে কীরকম হয়? চোখ বন্ধ করল সে। এভাবে শুলে কি তিনিদিন আগে তার ঘুম আসত?

‘ডক্টর।’

বেশ জোরে ডাকটা কানে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল সৌমিত্রর। সে চোখ মেলল। ঘরে এখন তিনজন লোক। একজন মোড়ায় বসে, বাকি দুজন দাঁড়িয়ে। এদের কাউকে সে কখনও দেখেনি। সেই ছেলোটিকেও আর দেখতে পাচ্ছে না সে।

যে লোকটা তাকে ডেকেছিল সেই মোড়ায় বসে আছে। একই গলার লোকটা বলল, ‘আমি তোমার অসুবিধে বুঝতে পারতেছি ডক্টর, কিন্তু কিছু করার নাই। ঘুম ঠিক আছে?’

‘খুব ভাল।’ উঠে বসল সৌমিত্র।

‘তুমি খুব মার্ট লোক। এর আগে তোমার জায়গায় ব্যাথা আসছিল তারা তো মেয়েমানুষের মতো পায়ে পড়ত। আমার নাম জেস্টার।’

‘জেস্টার?’

‘নামটা আগে শুনছ মনে হয়।’

‘এটাই কি আপনার আসল নাম?’

‘আসল নামের কথা এখন আর মনে নাই। ডক্টর, তুমি বাসুদেব রিপোর্টারের শালা?’

‘কেন?’

‘ডি আই জি যদি তোমার বাপ হয় তা হলে তোমার বোনকে তো সে বিয়া করছে।’

‘হ্যাঁ।’

‘শুভ। এখন বলা, এখানে কেনও অসুবিধা হয় নাই তো?’

‘আমাকে বলা হয়েছিল পেশেন্ট দেখতে হবে।’ তাকাল বাসুদেব।

‘নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু ডক্টর, তোমাকে আর একটা চিঠি লিখতে হইব।’

‘আমি তো লিখেছি।’

‘হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ।’ পুকেট থেকে কাগজ আর কলম বের করে এগিয়ে দিল জেস্টার, ‘দ্বিতীয় চিঠিটা না লিখলে ডি আই জি সাহেবের মাথা পরিষ্কার হইব না।’

সৌমিত্র প্রস্থ করল, ‘বাবা কি এখনও টাকা দেননি?’

‘দুশ্বের কথা আর কী বলুম ডক্টর। তার নাকি অত টাকা নাই। ভাবো, পুলিশের ডি আই জির ওই কথা শুনেলে পাবিও হাসব। টাইম নিচ্ছেন। তুমি লিখি যা দাও, দেশের প্রয়োজনে ওই টাকা অবিলম্বে দিতে। না দিলে তুমি আর বাইচ্যা ফিরবা না। সামনেই পূজা আসতেছে, কথটা কেন তারা খেলালে রাখে।’

বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে চিঠিটা লিখল সৌমিত্র। শুধু তার সঙ্গে জুড়ে দিল, বাসুদেবকে আমার কথা বললেন। জেস্টার চিঠি পড়ে চোখ ছোট করল। ‘কী কথা?’

‘কিন্তু না। এইরকমই তো চিঠিতে লেখে।’

‘বউয়ের কথা লিখি না, মায়ের কথা লিখি না, লিখিলা ভগ্নিপতির কথা?’

‘আপনি একটু আগে নাম বললেন, তাই।’

‘হ্যাঁ। রিপোর্টার লোক ভাল। এন এল এফের শুভাচা এগারোজনকে গ্রেপ করছে।

তাদের পিঠে ব্রিস্টলদের চিহ্ন আঁকছে। সেই ববর তোমার শালা সমস্ত দুনিয়ার ঘোষণা দিচ্ছে। আমাদের কথাও বলে। কিন্তু ডি আই জি সাহেব একটা ভাল কাজ করছেন, পুলিশকে কিছু জানান নাই। সেই কারণেই তুমি বাইচ্যা আছ ডক্টর। ঠিক আছে, ভিনার দিতেছে, বাইচ্যা রেডি হও, বাইতে হইব।’ জেস্টার বেরিয়ে গেল চিঠিটাকে নিয়ে।

তার মানে এখানেই যাত্রার শেষ নয়, আবার যেতে হবে। সোটা দৌড়ে যাওয়া হলেও কিছু করার নেই। পায়ের দিকে তাকাল সে। ছুতোটা খুলে রেখেছিল, খুলে গিয়েছে বেশ। ক্ষতবিক্ষত অবস্থা।

খটা দুয়েক পরে বাবার এল। সেই একই মেদ। তবে এখন ভাত গরম, জলে ডোবানো নয়। তরকারি সেই ষটকি মাছের গরগরে কাল। অনেক কষ্টে বমি গিলে গিলে পেটে ঢোকাল ওগুলো। এটা না খেলে পরে হয়তো পশতাব হবে।-হয়তো কাল বিকেলের আগে কিছু ছুতোই না।

রাত ব্যারোটা নাগাদ জেস্টার এল, ‘শরীর ঠিক আছে ডক্টর?’

‘পায়ের অবস্থা দেখুন। এই পা নিয়ে ইটটা যায় না।’

জেস্টার পা দেখল। তারপর দরজার বাইরে দাঁড়ানো লোকদের কিছু বলল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোকটা ফিরে এল একটা কাপড়ের ছুতো নিয়ে। জেস্টার বলল, ‘টাই করে!’

‘কেন?’

‘বেশি আরাম হইব।’

চামড়ার ছুতো রেখে দিয়ে কাপড়ের ছুতোয় পা গলিয়ে একটু আরাম হল।

চামড়ার ছুতো বদলে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

জেস্টার একটা কাগজ কলম এগিয়ে দিল, ‘ওমুন্সের নাম চাই।’

‘কী ওমুন্স?’

‘সোটা জানো তাই তুমি ডক্টর। তোমার পায়ের যা অবস্থা তা অনেকের হয়।’

‘এখানে কোথার পাওয়া যাবে?’

‘সে চিন্তা তোমার না ডক্টর।’

অন্তঃব নিজের দুটো পা সারাতো যে যে ওমুন্স দরকার তার নামও লিখল, ‘কখন হাতে পাওয়া যাবে?’

‘জানি না।’ জেস্টার উত্তর দিল।

শুভরমশাই যেন এরকম অনুরোধ জামাইয়ের কাছ থেকে শুনবেন কখনও ভাবেননি। অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ‘রিভলভার নিয়ে তুমি কী করবে?’

‘দরকার না থাকলে আমি চাইছি কেন?’ বাসুদেব গম্ভীর মুখে কথা বলল।

‘তোমার কীসের দরকার? একজন রিপোর্টার কখনও রিভলভার নিয়ে ঘোরে নাকি? তা ছাড়া আমার নামে সাইসেলড্ আর্ম আমি তোমাকে ব্যবহার করতে দেব

একথা ভাবলে কী করে? পি বি উত্তেজিত।

‘আমি রিভলভার চেয়েছি কিন্তু ব্যবহার করব তো বলিনি।’

‘তা হলে ওটা নিয়ে কী করবে?’

‘ওটা দেখাও তো কাজ হয়।’

‘হয়। কিন্তু তাকে হুমকি দেওয়া বলে। রিভলভার দেখিয়ে তুমি কাউকে রায়কেমেল করতে পারো না।’

‘বেশ, আপনার যদি আপত্তি থাকে দেখেন না। আমাকে এক্ষেত্রে একটা রিভলভার বিনতে হয়।’

‘কী সর্বনাশ? তুমি কোথেকে কিনবে?’

‘আশ্চর্য, ত্রিপুরার এত অল্প আসছে কোথেকে তা আপনি জানেন, কোথায় তার কেনাঘোড়া হয় তাও অজানা নয়। তাই না?’ উঠে দাঁড়াল বাসুদেব।

‘আশ্চর্য, তুমি একজন সং রিপোর্টার হয়ে বেআইনি রিভলভার কিনবে? যদি ধরা পড় তা হলে আমার সম্মান থাকবে? না, না, এসব করো না।’

‘আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে অথচ আপনি এখনও আইনের আশ্রয় নেননি এটা প্রচারিত হলে আপনার সম্মান থাকবে? আপনি জানেন না আপনার যাঁরা ছুনিয়ার অফিসার ছিলেন তাঁরা চাইছেন ব্যাপারটাকে প্রচার করতে। আমাকেও তাঁরা অনুরোধ করেছেন। আচ্ছা, এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল তবু ত্রিপুরার কাগজগুলো ভেতরের পাতায় নিউজ করল, ডাক্তার অপরহৃত বলে। আপনার কথা কোথাও লেখেনি। এটা কী করে সম্ভব হল তা আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারি। ছেলেকে বাঁচাতে আপনি নিজে সম্পাদকদের অনুরোধ করেছেন খবরটা নিয়ে হাইটাই না করতে। বলুন, করেনি?’ বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়লেন পি বি, ‘হ্যাঁ, কিন্তু ওকে বাঁচাতে এটা করতে হয়েছে।’

‘ঠিক। আমি আপনার কাছে রিভলভার চাইছি সৌমিত্রকে বাঁচাতেই।’

‘কীভাবে সেটা সম্ভব?’

‘আমি আজ আপনাকে ব্যাখ্যা করব না। আগামীকাল হয়তো বলতে পারব।’

পি বি কিছুক্ষণ দূর হাতে মাথা টিপে বসে নইলেন। তারপর বললেন, ‘আমার বেডরুমের আলমারির ওপরের তাকে ওটা আছে। কিন্তু আমি নিজের হাতে তোমাকে দিতে পারব না।’

বাসুদেব ভেতরে ঢুকতেই শাওভি তাকে ধরলেন, ‘কিন্তু খবর পেলে বাবা?’

‘এখনও সঠিক খবর পাইনি তবে পেয়ে যাব।’

‘কবে পারে? চিন্তায় চিন্তায় আমি তো পাগল হয়ে গেলাম।’

নীলা এল, ‘ওরা আগরতলা শহর থেকে টেলিফোনে কথা বলল অথচ কিছু করা যাচ্ছে না?’

‘না। কারণ যে ফোন করেছিল সে হয়তো এখানকার কোনও সরকারি অফিসে সামান্য কাজ করে। এই ফোনটা করাই তার দায়িত্ব। কোনও রেকর্ড নেই। পুলিশকে বললেও পাবলিক ফোন থেকে যে করেছে তা খুঁজে বের করতে পারত না।’ বাসুদেব বলল।

‘তা হলে কী হবে?’

‘দেখি, আজ হয়তো খবর পাব।’

‘কীভাবে?’

‘আমাকে আজ একবার সিংহাই যেতে হবে।’

‘কেন?’

‘ওখানে একজন পরিচিত লোক আছে যে খবরটা নিতে পারে।’

‘তাকে ফোন করা, যাওয়ার কী দরকার?’ নীলা বলল।

‘ওটা প্রায় গ্রাম। কোনও ফোন নেই।’

‘আমার ভয় করছে। ওখানে বাঙালি আছে?’

‘থানার দারোগাই তো বাঙালি।’

‘তিনি তো পুলিশ, পুলিশদের ওরা ধরে না। তোমার যদি কিছু হয়।’

‘তোমার কথা শুনে চললে আগরতলা থেকেই বেরকেনা যাবে না।’

‘না। তুমি একা যাবে, একটা ছুরি যদি কেউ দেখায় তা হলেই হয়ে গেল।’

‘বেশ। একা যাব না। তোমাদের জাইভারকে বলো জিপটা চালাতে।’

প্রত্যবর্তায় একটু বসি পেল নীলা। এ বাড়িতে দুটো জাইভার ছিল। একজন পুলিশের চাকরির সূত্রে, আর একজন বাড়ির গাড়ি চালাত। অবসর নেওয়ার পর শুধু সে-ই আছে। লোকটার নাম বরিন, ভাল জোর আছে গায়ে। কিন্তু খালি হাতে ওরা কী বা করতে পারে।

নীলা জিজ্ঞাসা করল, ‘ওখানে গেলে তুমি খবর পাবে?’

‘একবারে সিংহাই করলে বলতে পারছি না, তবে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।’

‘কিন্তু তুমি খালি হাতে যাবে?’

‘অল্প কোথায় পাব?’

‘তুমি এবার একটা রিভলভারের জন্যে অ্যান্ডাই করাবে।’

‘বেশ। কিন্তু অ্যান্ডাই করলে আজই তো ওটা হাতে পাব না। এক কাজ করা, কয়েক ছটার তো ব্যাপার, তোমার বাবার রিভলভারটা এনে দেবে?’ বাসুদেব এতক্ষণে আসল কথায় এল।

‘উরে বাবা। বাবা জানলে মেরে ফেলবে।’

‘উনি জানেন।’

‘জানেন মানে?’ হাঁ হয়ে গেল নীলা।

‘প্রথমে রাঙি হননি। পরে নিতে বলেছেন কিন্তু উনি নিজের হাতে আমাকে দেবেন না।’

‘কেন?’

‘আমার কাছে ওটা রাখা বেআইনি।’

‘কোথায় আছে?’

‘ওর বেডরুমের আলমারির ওপরের তাকে। যাও নিয়ে এসো।’

নীলা একবার খামীর দিকে তাকাল। তারপর দ্রুত চলে গেল। মাঝে মাঝে বিগড়ালেও নীলা তার সঙ্গে ভালই ব্যবহার করে। এখন ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে শুধু

বিভলভার কেন, অন্য কিছু করতেও বিধা করত না। নীলা ফিরে এল খাপ সমেত বিভলভার আর গুলির বাগটা নিয়ে।

‘এতে গুলি ভরা আছে কি না জানি না।’

‘ঠিক আছে। মা বা বউদিকে বলার দরকার নেই।’

নীলা মাথা নাড়ল।

‘আসি। ফিরে-এসেই ফোন করব।’

‘তুমি কি এখনই যাচ্ছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘দাঁড়াও, বন্ধিমকে ডাকছি।’

ভেতরের ব্যারান্দায় গিয়ে বন্ধিমকে পাওয়া গেল। সিংহাই যেতে হবে শুনে তার চোখ ছানাবড়া। বলল, ‘আপনাদের মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? ওখানে গেলে জান নিয়ে ফেরা যাবে না।’

‘তোমার জানের দায়িত্ব আমার। জিপটাকে বের করো। এই নাও টাক, ফুল ট্যাক তেল নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে আমার বাড়িতে চলে এসো। নীলা, আসছি।’ বাসুদেব বলল।

‘এসেই ফোন করবো। দুর্গা দুর্গা।’

বাসুদেবের ডাল লাগল। নীলার প্রার্থনা কাজে লাগুক।

অনেকগুলো পকেটওয়ালার সুতির জ্যাকেট আর জিন্স পরে নিল বাসুদেব। এখন সম্ভব। রায়ে কোথায় আবার ছুটবে তা ঈশ্বর জানান। এসময়ে অনেকে খেতে পারে, সে পারে না, তবু কিছুটা খেয়ে, কিছু সঙ্গে নিল সে। এইসময় বন্ধিম গাড়ি নিয়ে এল তার বাড়িতে।

বন্ধিম বলল, ‘দিনেরবেলায় গেলে হত না স্যার?’

‘না।’

‘আমার খুব ভয় করছে স্যার।’

‘তোমাকে গাড়ি চালানো ছাড়া কিছুই করতে হবে না।’

‘কিন্তু আমাকে যদি ধরে নিয়ে যায়?’

‘তোমাকে ধরবে কেন? ধরলে কী পারে?’

‘কী বলছেন স্যার। ওরা একটা রিকশাওয়ালাকে ধরেছিল। পাঁচ হাজার নিয়ে ছেড়েছে।’

‘তার দু নম্বর। সস্ত্রাসবাদী নয়।’

ওরা যখন রওনা হল তখন সঙ্গে সাড়ে সাতটা। আগরতলা পার হতেই রাস্তা ফাঁকা। মাপটা টর্চের আলোর দেখে রাস্তা বলে দিচ্ছিল বাসুদেব। বন্ধিম গাড়ি চালাচ্ছে প্রায় রোবটের মতো। মুখে কোনও কথা নেই। মাঝে একবার রাস্তার পাশে চারটে ছেলে দেখতে পেয়ে ফিসফিস করে জানতে চেয়েছিল, ‘গাড়ি কি থামাব না চালাব?’

‘ওরা তোমাকে থামাতে বলছে না বন্ধিম।’

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধিম গাড়ির গতি এত বাড়াল যে ছেলেগুলো অবাক হয়ে গেল।

অবশ্য এইসময়ে অন্ধকার রাস্তায় ওরা কী করছে এ নিয়ে শেষ থাকতেই পারে। আশেপাশে তো গ্রাম ছাড়া কিছু নেই। সিংহাই-এর কাছাকাছি এসে দেখা গেল রাস্তার ওপর বড় বড় পাথর সাজানো। দুব থেকে হেডলাইটের আলোয় নেটা দেখতে পেয়ে বন্ধিম বলল, ‘সর্বনাশ। গাড়ি থামলেই সর্বনাশ হবে।’

‘পাশের মাঠে নেমে যাও।’

বলতে বলতেই বন্ধিম একই গতিতে গাড়ি রাস্তা থেকে মাটিতে নামিয়ে দিল। জিপ বলেই ওইরকম এম্বোশেবড়ো মাঠের আমেলা কাটিয়ে আবার রাস্তায় উঠে আসতে পারল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। যারা ব্যারিকেড করেছিল তারাও আওয়াজ করল না।

‘সেখলেন স্যার।’ বন্ধিমের গলা কাঁপেছে।

‘সেখলাম। খুব ভাল চালালে।’

‘যদি আমাদের ধরত—।’

‘ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে যেত না। এরা ভ্রমি কিংবা সস্ত্রাসবাদী নয়। শ্রেফ ডাকাতি করার জন্যে রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল।’

‘কী করে বুঝলেন স্যার?’

‘ওরা চোরের মতো লুকিয়ে থাকে না। রাইফেল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।’

মনে কিছুটা স্বস্তি পেল বন্ধিম। সিংহাই এসে গেল। বন্ধিম জিজ্ঞাসা করল, ‘কোথায় যাব?’

‘একটা জায়গায় দাঁড় করাও।’

এখন নটা বেজে গেছে। বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় লোকজন নেই। কিছুকাল অপেক্ষা করার পর সাইকেলে আসা একটা লোককে থামিয়ে বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, ‘থানাসি কোথায়?’

লোকটা মুখে কোনও কথা না বলে আঙুল তুলে বা দিকটা দেখিয়ে চলে গেল।

সেনিকে কিছুটা যেতেই থানার আলো দেখতে পেল ওরা। তিনজন সেপাই ব্যারান্দায় বসে আছে বন্দুক হাতে নিয়ে। জিপটাকে গेट পেরিয়ে একেবারে সিঁড়ির কাছে নিয়ে যেতে বলল বাসুদেব। গাড়ি থামারই দুজন সেপাই ছুটে এল, ‘আরে, গাড়ি ভেতরে কেন? কী চাই?’

‘দারোগাবাবু আছেন?’

‘আছেন। কে আপনি? কী চান?’ লোকটি ব্যঙালি।

সিংহাই-এর ও সি ভাবতেই পারেননি ওইসময় কোনও রিপোর্টার জিপে ঢেপে তার থানায় আসতে পারে। বাসুদেবের নাম তিনি শুনেছেন। সে রিপোর্ট পাঠালে তা সমস্ত পৃথিবীর মানুষ রেডিওতে শোনে, টিভিতে দেখে। এরকম একজন রিপোর্টার এসেছেন একা এইসময়ে তার কাছে?

‘কী ব্যাপার বলুন তো?’ ভক্তলোক খুব খাতির করে বসালেন।

‘আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি অস্বাভাবিক কিছু করেছি।’ বলল বাসুদেব।

‘আলবত করেছেন। আপনার মা-বাবা পুত্রহারা হতে পারতেন, আপনার স্ত্রী বিধবা হয়ে যেতেন। এইসময়ে আমরাই দু-তিনটে গাড়ি ভর্তি সেপাই না নিয়ে কোথাও টহল

দিতে যাই না আর আপনি একজন জ্বাইভারকে নিয়ে এখানে চলে এলেন! আসবার সময় কেনও সমস্যা হয়নি?

‘হয়েছিল। রাস্তা জুড়ে পাথর সাজিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে আমরা গাড়ি ধামাই।’
‘ধামানি তো?’

‘না।’ বাসুদেব বলল, ‘মনে হয়েছিল ওরা নেহাতই গ্রাম ডাকাত।’

‘হ্যাঁ। এবাই আমাদের কাজ কমিয়ে দিয়েছে।’

‘বুঝলাম না।’

‘ডাকাতি হওয়ার ভয়ে পোকে আর সঙ্কের পর আসা যাওয়া করে না।

সন্ন্যাসবাদীদের গাড়িও অটিকে যায়, দু’চারটে ডাকাত তখন ওদের গুলিতে মরে।

ব্যকিরা পরে গ্রাম ছেড়ে ভয়ে পালায়।’

‘ডাকাতরা ওদের সঙ্গেও টকর দিতে যায়?’

‘গাড়ি দেখে বুঝতে পারে না। বুঝলে নিশ্চয়ই যেত না। তাই বলছিলাম, আমাদের আর ডাকাত ধরার জন্যে ব্যস্ত হতে হয় না। এখন বলুন কোথায় এসেছেন?’ ও সি জিজ্ঞাসা করলেন।

‘আপনার এখানেই।’

‘আমার সম্পর্কে কেনও খবর পেয়েছেন নাকি? দেখবেন মশাই, আমি পাবলিসিটি চাই না।’

‘আমি আপনার সাহায্য চাই।’ বাসুদেব বলল।

‘নিশ্চয়ই। বলুন।’

‘এখান থেকে এসরাইবাজার কত দূরে?’

‘সর্বনাশ। এসরাইবাজারের খোঁজ নিচ্ছেন কেন?’

‘আমাকে একবার যেতে হবে।’

‘এখন যাবেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি সুস্থ আছেন তো মশাই? ওটা ওয়ান অফ দি মোস্ট ডেঞ্জারাস এলাকা।

দিনেরবেলায় আমরা যাই জানান দিয়ে, রাত্রে গেলে ফিরতে হবে না।’

‘কেন?’

‘রাত্রে যে কোনও আগতুককে ওরা শত্রু বলে মনে করে।’

‘কিছু ওখানকার পক্ষায়েত তো সি পি এমের দখলে?’

‘এই সি পি এম কি কমুনিষ্ট পার্টি মার্কসিস্ট ডেবেছেন? সি পি এম ব্যানারটা ব্যবহার করলে সুবিধে হয় বলে করে। কখনও কখনও বাধা হয়েছি বিশাল দল নিয়ে ওখানে গেইডে যেতে। কী করে যে আগাম খবর পেয়ে যায়, একবারও কড়িৎ ধরতে পারিনি। এরওপর আর একটা সমস্যা। ওখানকার মেয়েরা খুব লড়াই টাইপের। পুলিশ দেখলেই দল বেঁধে এগিয়ে আসে। কিছু এসরাইবাজারে আপনার কী দরকার?’ ও সি জিজ্ঞাসা করলেন।

বাসুদেব মুহূর্তে ভেবে নিল নামটা বলবে কি না। অতীত অভিজ্ঞতা ভাল নয় বলে সে বলল, ‘আমি একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলব যার শ্বুতিশক্তি খুব ভাল।’

‘শ্বুতিশক্তি ভাল? আমি নাকের ভগায় থানায় বসে খবরটা পাইনি অথচ আপনি আগরতলায় বসে পেয়ে গেলেন। ওহো! ডি আই জি সাহেব তো আপনার শত্রু।’
ও সি-র হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

‘উনি এখন আর ডি আই জি নন।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। তা হলে আপনার শাল্যকেই—।’

‘হ্যাঁ।’

‘কেনও খবর পেয়েছেন?’

‘না।’

‘করা নিল?’

‘বোঝা যাচ্ছে না।’

‘দেখুন কী অবস্থা। শুনেছি ডাক্তার হিসেবে মানুষটা মন্দ ছিলেন না।’

‘অতীত কাল ব্যবহার করছেন কেন? এখনও তো ওঁর মৃত্যুসংবাদ আসেনি।’
বাসুদেব উঠে দাঁড়াল।

‘আর বলবেন না। সব কাল এখন একাকার হয়ে যাচ্ছে।’

‘তা হলে কীভাবে যাব বলুন।’

‘সত্টি যাবেন?’

‘আশ্চর্য! আমি কি মিথ্যা বলতে এত দূরে এসেছি?’

‘তা হলে তো লোকজনকে ডাকতে হয়।’

‘কড়িকে ডাকতে হবে না। একটু আসে বললেন তো আপনারা ওখানে পৌঁছোবার আগেই সবাই হাওয়া হয়ে যায়। আপনি একটা কাগজে ওখানে পৌঁছোবার রোড ম্যাপটা একে দিন।’ বাসুদেব বলল।

ও সি গভীর মুখে একটা কাগজে কয়েকটা লাইন একে বললেন, ‘এই যে রাস্তাটা, এটা দিয়ে সোজা মাইলখানেক বাওয়ার পর ডানদিকে রাস্তা পাবেন। রাস্তাটির দু পাশে দুটো বিশাল বটগাছ আছে। ভুল হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ওই রাস্তা ধরে আরও দু ক্রোশ গেলে পেয়ে যাবেন।’

‘তার মানে টোটাল পাঁচ মাইল?’

‘হ্যাঁ। নতুন জায়গা, তার ওপর অন্ধকার। খন্টা দুয়েক লাগবে। তার মানে ওখানে মধ্যরাত। আর একবার ভাবুন মশাই। আগুন হাত দিলে হাতটা পোড়ো।’

‘কীভাবে হাত দিচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করছে।’

‘বেশ। আমার বিবেক পরিকার। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব অনেক অনুপ্রোধ করেছে।’

‘যদি চান তো বড লিখে যেতে পারি।’

‘তার দরকার নেই।’ ও সি হাত নাড়লেন।

‘আপনি যখন আমার নিরাপত্তা নিয়ে এত ভাবছেন তখন একটা সাহায্য চাইছি।’
‘বলুন।’

‘একটা সাইকেল পেতে পারি?’

‘সাইকেল? অ। নিয়ে যান। ফেরত না পেলেও কতি নেই। চোরাই মাল উদ্ধার



করেছিলাম মাস তিনেক আগে। আজও কেউ কেইম করেনি।'

'আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমার ভাইভারটাকে থানায় আশ্রয় দিবেন?'

'ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না?'

'এই অবশিষ্ট ও কোনওমতে এসেছে, এখান থেকে এসোতে বললে ও বিদ্রোহ করবে।'

'ধাক্কা!'

বাসুদেব বাইরে বেরিয়ে দেখল বন্ধিত বসে বসি মসপাইদের সঙ্গে গল্প করছে। ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল বন্ধিম। বাসুদেব বলল, 'তুমি এখানেই থাকো। যদি শোওয়ার জগাফা পাও ঘুমিয়ে নিয়ো। আমি হয়তো কাল সকালে ফিরব। যদি দুপুরের মধ্যে না ফিরি তা হলে বাড়িতে খবর দিচ্ছি।'

'সার!' বন্ধিমের গলা ভিলে গেল।

'যা বললাম তাই করবে।' কথাগুলো বলতেই বাসুদেব দেখল একটা মেপাই সাইকেল নিয়ে তার কাছে আসছে। বাসুদেব সাইকেলটা নিল। আলো নেই, পুরনো রঙের সাইকেল। এবং তখনই তার খেয়াল হল ও সি-র কথা যদি সত্যি তা হলে অন্যভাবে বিপদ আসতে পারে। লোকগুলো নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করবে। আর তা হলে ওরা তার শরীরে তমসি চালাবেই। রিভলভারটা হাতে তুলে আর রক্ক থাকবে না। তার রিপোর্টার তকমাটা কোনও কাজেই লাগবে না। সে তো সেইসময় এক গ্রাম লোককে রিভলভার দেখিয়ে ডল পাওয়ার পরেই বাসুদেব সাইকেলটা নিয়ে জিপের কাছে গেল। এখন একটা প্যাস জিপটাকে রেখেই গেল। সোজা ভেতরে ঢুকে সিটের পেছনে ফেলে রাখা টায়ারের নীচে রিভলভারটাকে রেখে দিল সে। চট করে কারও চোখে পড়বে না।

শাইরে বেরিয়ে আসতেই সে দেখল বন্ধিম অবাক হয়ে তাকে দেখছে। সে ভাবছিল সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে কি কারণে সাহেব জিপে উঠলেন। বাসুদেব বন্ধিমকে ডাকল, 'আমি আসার আগে কেউ যেন জিপে না ওঠে। বুঝলে?'

বন্ধিম নীরবে মাথা নেড়ে জানাল, সে বুঝেছে।

গেটের বাইরে থানার আলো ফেঁটুক পড়েছে তার বাইরে পুখিঁটা অন্ধকার। সেখানে পৌঁছে সাইকেলে উঠে বাসুদেব দেখতে পেল ও সি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সে গ্যাভেলে চাপ দিল। রাস্তাটা মাটি। কিন্তু শক্ত মাটি। দু'পাশের বাড়ির অন্ধকারে ডুবে আছে। এখানে বোধহয় কেউ রাত জাগতে চায় না। মিনিট তিনেকের মধ্যে বাড়িগুলো পেছনে পড়ে রইল। এখন আর সাইকেল জোরে চালানো যাচ্ছে না। এবড়োষড়ভাবে রাস্তার মাঝে মাঝেই বেশ বড় গর্ত। অন্ধকারে ভাল গোনাও যাচ্ছে না। অন্যভাঙ বাসুদেব দুবার পড়তে পড়তে সামলে নিল। একটা সময় মনে হল, সাইকেল না নিয়ে এসে হেঁটে এলেই ভাল হত। এখন দু'পাশে মাঝে মাঝেই বড় গাছ। আকাশ পেছনে থাকায় গাছগুলোকে বোঝা যাচ্ছে। ও সি বলেছিলেন মাইলখানেক বাদে রাস্তাটা, যেটা চেনার উপায় হল দু'দুটো বড় বটগাছ।

আদমাইল আসতে অনেক কসরত করতে হল। এমিকের রাস্তা সারাবার দায়িত্ব যাদের ওপর তারা নিশ্চয়ই টাকা নিচ্ছে কিন্তু সেটা আর খরচ করছে না। এইসব

লোক এত ক্ষমতাবান হয় যে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। বাসুদেব এখন রাস্তা ছেড়ে পাশের ঘাসের ওপর দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছিল। এবং হঠাৎই তার চোখে বটগাছদুটো ধরা পড়ল। সত্যি গাছদুটোকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। দুটো গাছের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটাও গিরে খেমেছে এসরাইবাঝারে। এখন রাত প্রায় এগারোটো। পথ এখনও দু'ক্রোশ বাকি।

বটগাছদুটোর নীচে আসামার আচমকা শব্দে চমকে উঠল বাসুদেব। যেন কোনও ব্যাঙ ছেলে কাঁদছে। এই অন্ধকারে ব্যাঙের কালা কী করে শোনা যাবে। চারপাশে তো বাড়িঘরের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে একটু থামছে কাল। কিন্তু তারপরেই প্রবলভাবে ফিরে আসছে। শব্দটাকে খেয়াল করল সে। ওপর থেকে আসছে বলে মনে হল। ভৃত্যসেতে কোনওরিন বিশ্বাস করেনি বাসুদেব। নীলার আবার ওসবে খুব বিশ্বাস। দেবতা যখন আছেন তখন ভৃত্য থাকবে না কেন? আজ এই নিঝুম রাত্রে লোকপালের বাইরে দুটো বিশাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হঠাৎ গা হুমহুম করে উঠল। নেঘোরে শ্রাণ্টি যাবে না তো? এবং তারপরেই কানে এল অদ্ভুত ডাকা। এই ডাক পারি। কোথায় যেন পড়েছিল শকুনের ছানার কান্নার সঙ্গে মানবশিশুর কান্নার মিল আছে। তার মনে গাছের মগতালের বাসায় শকুনের বাচ্চা কাঁদছে। একটু স্বস্তি এল। গ্রামের রাস্তায় সাইকেল চালান সে।

এই রাস্তাটা ভুবু ডাল। জোরে চালানো যাচ্ছে না অন্ধকারের জন্যে কিন্তু টলতে হচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আকাশের প্রান্তে গাছগাছালি এবং বাড়িঘরের আভাস পেল। এবং আশ্চর্য ব্যাপার ওখানে আলো চিকচিক করছে। তার মনে এখনও মানুষজন ভেসে আছে।

আর একটু এসোনাওয়ার কুকুরের ডাক ভেসে এল। গ্রামের কুকুরগুলো রাতে অচেনা মানুষ দেখলেই বিক্রম দেখায়। দাঁড়িয়ে গেল বাসুদেব। এখন সে গ্রানটার মুখে এসে পড়েছে। চিৎকার করতে করতে সারমেয়র দল ছুটে এসে থমকে দাঁড়িয়ে সমানে ডেকে চলেছে। ওদের দিকে এগোতে সাহস পাচ্ছিল না সে। এখন বোঝা যাচ্ছে রাত্রে পুলিশ এই গ্রামে এসে কোনও অপরাধীকে কেন বুঁজে পায়নি। এই কুকুরগুলোই গ্রামের লোকদের সতর্ক করে দেয়, ওরা বুঝতে পারে অচেনা মানুষ এসেছে। অতএব পালবার সময় পেয়ে যায় ওরা। আর একটু এগোতেই কুকুরগুলো লাফিয়ে উঠল গর্জন করতে করতে। কিন্তু ওরা তার দিকে ছুটে আসছে না, আক্রমণ করছে না, একটা সীমা পর্যন্ত এসে আর এগোচ্ছে না। এইসময় গলা পাওয়া গেল। একাধিক ব্যক্তি যেন কুকুরগুলোকে ধমক দিচ্ছে। একটু পরেই তিনজনকে দেখা গেল। অন্ধকারেও আলো থাকে। অতএব সেই আলোতে তাকে দেখতে পাবে একজন ভেতরে ছুটে গেল। বাকি দুজন চিৎকার করে কিছু বলল। বাসুদেব বুঝতে পারল ওরা তার পরিচয় জানতে চাইছে। সাইকেল থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই গ্রামের ভেতর থেকে আরও কিছু মানুষ বেরিয়ে এল।

একটা হাত সাইকেলের হ্যান্ডলে, অন্য হাত আকাশে তুলল বাসুদেব। লোকগুলো কাছে এগিয়ে এলে দেখা গেল প্রত্যেকের হাতে শক্ত লাঠি রয়েছে। ওদের একজন রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি?'

‘আমি একজন রিপোর্টার।’
রিপোর্টার শব্দটা শোনামাত্র ওরা পরস্পরকে দেখল। প্রথম প্রশ্নটা এসেছিল উপজাতিদের ভাষায়। দ্বিতীয়টা এল বাংলায়, ‘বাত্তালি বলে মনে হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ।’
‘বাত্তালি রিপোর্টার হয়ে এই এলাকায় এসেছ, মন্তলবীটা কী?’
‘একজনের সঙ্গে দেখা করা খুব দরকার।’
‘কর সঙ্গে?’
‘দশরথ দেববর্মা।’ বাসুদেব নামটা বলামাত্র ওদের প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল। ওরা এই নাম আশা করেনি।

‘তিনি এখন এই গ্রামে আছেন জানলে কী করে?’
‘অগারতলার সি পি এম অফিসে গিয়েছিলাম। তারাই বলল উনি গ্রামে আছেন।’
‘তিনি তোমাকে চেনেন?’
‘জানি না। তবে তিনিই বলতে পারবেন চেনেন কি না।’

ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে একজনকে পাঠানো হল খবর নিতে। বাসুদেব দেখল ওরা কেউ কথা বলছে না। দশরথ যদি দেখা না করতে চায় তা হলে কী করবে ওরা? তারার আলায় ওদের অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। এক-দুই করে বেশ কিছু মিনিট যাওয়ার পর লোকটা ফিরে এসে ঘোষণা করল তাকে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

সাইকেল সমেত তাকে প্রায় ঘিরে ধরে নিয়ে এল ওরা গ্রামের ভেতরে। ঘরগুলো ফাঁকা ফাঁকা, মাঝখানে একটা মাঠমতন জায়গা। যে কোনও দিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু কেউ এলে এরা দূর থেকেই তাকে দেখতে পাবে। রাতে পাহারাদারির কাজ করা হয় কি না বোঝা যাচ্ছে না। একটি কাঠের বাড়িতে আলো জ্বলছিল। বেশির ভাগ বাড়ি কাঠের একতলা, এটি আয়তনে বড়। বাড়িটার দরজা খোলা, আলো বেরিয়ে এসেছে বাইরে। একজন দরজায় পৌঁছে জানাল, নিয়ে আসা হয়েছে।

‘কে? কে? এখানে আসো!’ গল্লা ভেসে এল।
সাইকেলটা একজনের হাতে ধরিয়ে বাসুদেব ভেতরে ঢুকল। একটা বড় হারিকেন জ্বলছে, নীচে সম্ভবত তক্তাপোশের ওপর লুঙ্গি পরে খালি গায়ে যে লোকটি বসে আছে তার বয়স পঞ্চাশের ওপরে হলেও শরীরে শক্তি আছে। এরই নাম দশরথ, ত্রিপুরার জঙ্গি আন্দোলনের অন্যতম নেতার বাবা, এখানকার গ্রামপ্রধান। দশরথ বলল, ‘চেনা চেনা লাসে।’
‘আমি রিপোর্টার, বাসুদেব।’

‘অ। তাই কও। ডি আই জি সাহেবের জামাই।’ দশরথ হাসল।
‘ওটাই আমার পরিচয় নয়। ওঁর মেরেকে নিয়ে করার আগেই আমি রিপোর্টারি করতাম।’

‘আরে তোমাকে তো সবাই জানে। তোমার গল্লা তো আমরা রেডিয়োতে শুনি। বসো, বসো রিপোর্টার। তোমাকে এখন এখানে দেখব, আশাই করি নাই।’ দশরথ কথাগুলো বলামাত্র একটি লোক এগিয়ে গিয়ে ওর কানে ফিসফিস করে কিছু

বলতেই সে হেসে ফেলল। বলল, ‘দেখো রিপোর্টার, এরা নিয়মের কথা বলতেছে। আরে তুমি এত দূরে আমাকে খুঁ করতে আসবা নাকি?’

‘মানে?’ হকচকিয়ে গেল বাসুদেব।
‘ওরা বলতেছে তোমার সাথে অস্ত্র আছে কি না পরীক্ষা করবে।’
‘বেশ তো করুক।’ বাসুদেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

দশরথ ইশারা করতেই দুটো লোক তার শরীর, পোশাক পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হল। দশরথ তাদের ধমক দিয়ে ঘর থেকে চলে যেতে বলল, বলে হাসল, ‘বসো রিপোর্টার, বসো।’

বাসুদেব বসল। সে বুঝতে পারছিল এই লোকটি অতি বুদ্ধিমান। এর সঙ্গে কথা বলতে হবে খুব সতর্ক হয়ে। দশরথ জিজ্ঞাসা করল, ‘বলো এত রাতে অইল্যা কেন?’
কীভাবে কথাটা তুলবে বুঝতে পারছিল না বাসুদেব। এখানে আসার আগে সে যে রকমটি ভেবে এসেছিল সেভাবে এসোনা যাবে না। সে ভেবেছিল লোকটা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে। সৌমিত্রের অন্তর্ধান-প্রসঙ্গ নিজেই তুলবে এবং তখন সেই কথার সূত্র ধরে সে লোকটার মুখ থেকে কথা বের করতে পারবে।

বাসুদেব বলল, ‘আপনি জানেন কি না জানি না আমার চাকরি সাহেবদের হাতে। সাগরের ওপারে যেখানে আমার রেডিয়ো আর টিভির হেড অফিস সেখানে বসে তারা শুধু ছতুক্ষু করে।’

‘কী ছতুক্ষু?’
‘এই করো, সেই করো।’
‘তুমি রিপোর্টার তাদের চাকরি কর, ছতুক্ষু তো মানতেই হয়।’

‘সেই হল কথা। নইলে চাকরি শেষ—।’
‘ঠিক আছে, শুনব তোমার কথা। আগে কও, এখানে অইল্যা কীভাবে?’ হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে দিয়ে নির্মিতিমি হাসতে লাগল দশরথ।

‘সাইকেলে।’
‘সেটা জানি।’ সাইকেলটা পাইলা কোথায়? সিঁধাইতে কেউ আছে নাকি?’
নিথো কথা বলে কোনও লাভ নেই। বাসুদেব বলল, ‘না, কেউ নেই। সোজা থানায় গিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, তো তারা বলল এই রাতে এখানে আসবে না। তখন আমি একটা সাইকেল চাইতে ওরা দিয়ে দিল।’

‘তুমি তো বেশ সচি কথার বল রিপোর্টার। তা আমার সাথে কী কথা তোমার?’
‘এই যে একটু আগে বলছিলাম—।’
‘তোমার চাকরি—।’

‘হ্যাঁ। ওরা জানতে চেয়েছে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষেরা কি স্বাধীনতা চায়?’
মাথা নাড়ল দশরথ, ‘আমার উত্তর শুনেও চাও?’

‘হ্যাঁ।’
‘গোনো। আমরা রাজাকে খুব ভক্তি করতাম। তিনি যখন ত্রিপুরাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করছেন তখন তাঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমি স্বাধীন ভারতের নাগরিক। আমার আর কী স্বাধীনতা দরকার?’ দশরথ হাসল।

‘আপনি সি পি এমের প্রবীণ নেতা। এখন যেসব আন্দোলন হচ্ছে তাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করেন না? আপনি বললেন, নতুন স্বাধীনতা চান না?’ বাসুদেব কথা ঝুঁজছিল।

‘রাতে খাইছ কিছু?’ আচমকা প্রশ্ন করল দশরথ।

‘জ্যাঁ?’

‘এখন অনেক রাত্রি। কিছু খাও তুমি।’ বলে হাততালি দিল দশরথ। সেটা শোনারমাত্র একটি সোকা ঘরে চলে এল। দশরথ বলল, ‘মেহমান আসছে, খাবার দিতে বসো।’

লোকটি চলে গেলে বাসুদেব বলল, ‘আমার কিছু না হলেও চলে যেত।’

‘না হলে তো সবই চলে। এই যে তার আছে কিছু বিজলি নাই, আমাদের চলতেছে না?’

‘ক্যারেন্ট সেরনি?’

‘আমরা নিই নাই। নিলেই তো পয়সা দিতে হইব। তা হলে এইটাই তোমার আসার কারণ?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘দেখো রিপোর্টার, আমি সি পি এম করি। কিন্তু আমার মত সি পি এম গরিবের বন্ধু। তাই এই গ্রামের কোনও মানুষ অন্য পাটি করে না। ভাগ্যভাগি নাই।’

‘তা হলে আপনারা সবাই নির্বাচনের সময় সি পি এম প্রার্থীকে ভোট দেন?’

‘পঞ্চায়েতের সময় অবশ্যই। বিধানসভা অথবা লোকসভার সময় কে প্রার্থী সেইটা আগে দেখি। তখন আমি যা বলব লোকে তাই করে। আমি পরাধীন না। বুঝলো?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু দলের আদেশ মানছেন না বলে পাটি অ্যাকশন নেয় না।’

‘সেইটা তাদের ব্যাপার, তাদের কাছে জবাব চাও।’ দশরথ হাসল, ‘তাইলে এই কথা জানবার জন্যে তুমি এই রাতে এত কষ্ট করলো?’

‘কষ্ট আর কীসের!’ বাসুদেব নড়েফড়ে বসতেই খাবার এল। এক ধান্দা ভাত আর লাগলে কোলওয়াল মাংস। ওটার রিক্তে তাকিয়েই মনে হল প্রচুর পরিমাণে আল দেওয়া আছে।

‘খাও রিপোর্টার, খাও।’

‘অতএব যেতে হল। এমন কুৎসিত মাংসের খোল সে কখনও যায়নি। রসুনের কড়া গন্ধ এবং ছিঁড়ে হওয়া মাংস। এটা কীসের মাংস জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছিল না। হয়তো উত্তরটা শোনার পর সে আর যেতে পারবে না। কোনওরকমে গলাধঃকরণ করে সে হাত ধোওয়ার জন্যে বাইরে বেরুতেই দেখল ঘটিতে জল নিয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। মুখ হাত ধুয়ে সে তাকাল। বাইরের উঠানে তখন জ্ঞানদাশেক মানুষ বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ তাকে এরা লক্ষ করে যাচ্ছে।

ঘরে ঢেকার পর দশরথ জিজ্ঞাসা করল, ‘তা হলে রাতে এখানেই থাকো রিপোর্টার।’

‘না না। আমি ফিরে যাব, কোনও অসুবিধে হবে না।’

‘হইতে তো পারে। বড় মাফাটা তো আমার হাতে নাই। এখন দু নখরি উপগ্রহীয়া

একটা বন্দুক হাতে পাইসেই হামলা করে সেখানে। তোমার কপাল ভাল যে আসার সময় কারও নজরে পড় নাই। এখন তোমার যদি কিছু হয় তো আমার খুব খারাপ লাগবে। রাতে এখানে ঘুমাও, সকালবেলার যাইতে পারো।’ দশরথ বলল।

রাতে এখানে থেকে যাওয়ার যেনম সুবিধা নেওয়া, এইসময় ফিরে যাওয়ার ভেটা করলে তার চেয়ে কম সুবিধা হবে না। সে যখন ঘুমাতে তখন এরা খুন করতে পারে, মুখ বন্ধ করে কোনও সোপান ডেরায় নিয়ে যেতে পারে। তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

‘রিপোর্টার, তামাক খাইবা?’

বাসুদেব দেখল চমৎকার দেখতে একটা ছোট্ট বাকো এখন দশরথের হাতে। সে মাথা নাড়ল, ‘না, আমি ধূমপান করি না।’

‘সিগারেট?’

‘না।’

‘তুমি দেখতেছি মানুষটা ভাল।’ ছোট ছোট টানে খোঁয়া উপভোগ করল দশরথ। তারপরে বলল, ‘ডি আই জি সাহেবের চাকরি শেষ?’

চমকে উঠল বাসুদেব। লোকটা এই গ্রামে বসে সব খবর রাখে। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

‘পুলিশ কখনও ভাল মানুষ হয় না বলে শুনছিলাম। কিন্তু হয়, এই যেমন তোমার স্বপুত্র।’

‘হ্যাঁ। উনি সব বলেই ওঁর সহকর্মীরা ওঁকে ঠাটা করত।’

‘করতে দাও। রিপোর্টার মরণ আইলে একাই যাইতে হয়। টাকা কেউ সাথে নিতে পারে না।’

‘আমার স্বপুত্রমশাইও তাই বলেন।’

‘ওঁর শরীর কেমন?’

‘ভাল।’

‘বউ বাচ্চা? সব ভাল আছে তো?’

বাসুদেব বুঝতে পারছিল লোকটা অভিনয় করছে। ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নে এল। সে বলল, ‘এতদিন সবাই ভাল ছিল। এখন, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন।’

‘কী রিপোর্টার? কী ব্যাপার?’ হুঁকটাকে একপাশে সরিয়ে রাখল দশরথ।

‘ওঁর একমাত্র ছেলে ভাঙল।’

‘তার নুনরে তুমি বিয়া করছ?’

‘হ্যাঁ। তাকে কদিন হল পাওয়া যাচ্ছে না।’ স্পষ্ট গলায় বলল বাসুদেব।

‘কী কও তুমি?’ সোজা হয়ে বসল দশরথ।

‘সবাই জানে। আপনি শোনেননি?’

‘পেপারে আসছে?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু স্বপুত্রমশাই পুলিশের কাছে ডায়েরি করেননি।’

‘কেন?’

‘ওরা বলেছে পুলিশকে জানালে ছেলেকে মেরে ফেলবে।’

‘করা? কারা করছে?’

‘টাইগার।’

‘টাইগার? টাইগার করছে তোমারে কে বলল?’

‘আমি জানি।’

‘হুম্। তারপর?’

‘টাকা চেয়েছে। মুক্তিপণ।’

‘কত?’

‘পঁচিশ লক্ষ টাকা।’

‘বাগ্‌স। এত টাকা ডি আই জি সাহেবের আছে?’

‘না নেই। আপনি তো জানেন, উনি অভ্যস্ত সং ছিলেন। ঘুম নেননি।’

‘তাইলে?’

‘ধার করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অত টাকা পাবেন কোথায়?’

‘ছেপেটারে কুখ্যাত রাখছে?’

‘সেটা জানি না।’

‘কিন্তু রিপোর্টার, তুমি রেডিওতে এই কথা বল নাই।’

‘কেনও প্রমাণ নেই কে কিডন্যাপ করছে। আমি যেটা জানি সেটা নেহাতই আমার অনুমান। খবরটা প্রচারিত হলে যদি ডাক্তারের বিপদ হয় তাই চেষ্টা আছি।’

বাসুদেব বলল।

‘ডাল করছ। পঁচিশ বড় বেশি হে।’

‘হ্যাঁ।’

‘কত দিতে পারবা?’

‘পাঁচ হলে উনি পারবেন।’

হেসে ফেলল দশরথ, ‘তুমি কি উদ্ভাব? পঁচিশ খিকা কেউ পাঁচে নামে? বড় সমস্যা। তুমি তাইলে এই কারণে আসছ?’

‘না। আপনি কথাটা না তুললে বলতাম না। মানে আপনাকে বললে তো সমস্যার সমাধান হবে না। মিছিমিছি পাঁচজনকে বলে কী লাভ? ন্যাকামি করল বাসুদেব।’

‘ন্যাখো রিপোর্টার, পঁচিশ যখন পারবা না তখন সাড়ে বারোতে নামো। সাড়ে বারো আর অড়াই, পনেরো। তাই তো? দশ কম হল। ডি আই জি সাহেব এটা পারতে পারেন।’

‘জানি না। গিয়ে বলব।’

‘তাইলে যাও, পাশের ঘরে গিয়া ঘুমাও।’ বলেই হাততালি দিল দশরথ। সঙ্গে সঙ্গে আগের লোকটি ঢুকল। তাকে নির্দেশ দিয়ে দশরথ বাসুদেবকে ইশারা করল। লোকটাকে অনুসরণ করে বাইরে বেরুতেই কুকুরগুলো আবার চিংকার শুরু করল। পাশের ঘরের কথা তাকে বলেছিল দশরথ কিন্তু লোকটা তাকে নিয়ে এল চারখানা বাড়ির পরে। একটা ঘরের দরজা খুলে ইশারা করে তাকে ঢুকতে বলল। সেখানে একটা কুশি ছিল। মাঝখানে একটা খাটিয়ার ওপর বিছানা পাতা। এ ছাড়া অন্য কেনও আসবাব নেই ঘরে। দরজা টেনে দিয়ে লোকটা বেরিয়ে গেলে বাসুদেব ৬৬

আবিষ্কার করল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই।

মাথা নাড়ল বাসুদেব। ওরা যখন ইচ্ছে তখন এই ঘরে ঢুকতে পারে। এখানে ঘুমানোটা নিশ্চয়ই নিরাপদ হবে না। অথচ দশরথের বিরুদ্ধে যাওয়া চলবে না। সামান্য অভ্যস্ত পেলেই এই গ্রাম থেকে ওরা কোনওমিনি বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে না। বাসুদেব খাটিয়াটাকে দেখল। পাতলা-গরির ওপর চাদর পাতা। চাদরটাকে তুলে নিয়ে সে ঘরের অন্য দিকে চলে গিয়ে মোকতে বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কুশির আলোটা ঘরে দ্বারা কাঁপাচ্ছে। সে আবার উঠল, ওটাকে নেতাল।

শোওয়ামাথ ঘুম আসছিল না। একটা কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, দশরথ বুঝতে পেরেছে সে কেন এখানে এসেছে। লোকটা যথেষ্ট চতুর। বুঝেও না বোকার ভান করছে। কিন্তু লোকটা নিজের কথায় ধরিয়ে দিয়েছে যে ওর সঙ্গে টাইগারের যোগাযোগ আছে। পঁচিশ লাখ টাকা খুব বেশি অতএব ঠিক অর্থে, সাড়ে বারো লাখে মুক্তিপণ নামিয়ে নেওয়া যেতে পারে যে বলেছে তার নিশ্চয়ই সেটা বলার মতো ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ টাইগারদের ওপর দশরথের কথা বলার অধিকার আছে। কিন্তু কেন? লোকটা সি পি এম করে আর টাইগাররা ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে মোটেই সমর্থন করে না। তা হলে? বাসুদেবের খোয়াল হল, সাড়ে বারো নেও, লোকটা আরও অড়াই চেয়েছে। এই অড়াই লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই কাজটা করে দেওয়ার জন্যে ওর কমিশন। লোককে যখন কমিশনের কথাটা পাক করে নেয় তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে সে কাজটা পারবে। তা হলে এখানে আসার আগে সে যেটা ভেবেছিল সেটাই সত্যি হতে চলেছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে জানে না, ঘুম ভাঙল রোদ উঠে যাওয়ার পর। উঠে দেখল তার মাথার পাশে জলের বোতল রাখা হয়েছে। সেটি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে মুখ ধুয়ে চোখ বন্ধ করে খানিকটা শেয়ে নিল সে। যে লোকটি গতরাতে তাকে এই ঘরে এনেছিল সে এসে দাঁড়াল সামনে। ইশারা করল অনুসরণ করতে। ব্যাধ হেলের মতো মাথা নাড়ল বাসুদেব।

দশরথ বসেছিল একটা চাতালে। তার সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন লোক মন দিয়ে কথা শুনছিল। বাসুদেবকে দেখে সে ওদের বিদায় করল। হেসে বলল, ‘বিছানায় কোনও দোষ ছিল?’

মাথা নাড়ল বাসুদেব, ‘বাড়িতেও আমি বাটে শুই না। মেরুদণ্ডের ব্যাধি জন্মে ডাক্তার মাটিতে শুতে বলেছে।’

‘অ। ঠিক আছে রিপোর্টার, তুমি এখন যাইতে পারো। গিয়া কথা বলো শওরের সাথে।’

‘এতে দেরি হয়ে যাবে।’

‘কেন? আগরতলার যাইতে কত সময় লাগে?’

‘প্রথম কথা, এই ব্যাপারটা শওরমশাই বিশ্বাসই করতে চাইবেন না।’

‘কীরকম শওর? জামাইয়ের বিশ্বাস করে না।’

‘ঠিক তা নয়। তা ছাড়া ধরুন, উনি বললেন দশ আর দুই, বারো, তার বেশি কিছুতেই পারবেন না। কথাটা আপনাকে জানানো আবার আমাকে আসতে হবে। হ্যাঁ,

এখন আপনি যদি বলেন পনেরোর এক পয়সা কম হলে আপনি নেই তা হলে অবশ্য আসবার দরকার হচ্ছে না—' বাসুদেব বলল।

'কথা অসত্য না। মানুষ একটা বাইশন কেনার সময় দরদারি করে আর এ তো লাখ লাখ টাকা। ঠিক আছে, তার সঙ্গে কোনে কথা বলে।'

'কেনে? আপনি পাগল হয়েছেন? শুনরাড়িতে যত ফেন যাচ্ছে সব ট্যাপ হচ্ছে। টাকাপয়সার কথা হলে সেটা পরের দিন কাপড়ে বেরিয়ে যাবে, আপনার নামও ছাপা হবে।'

'আমার নাম? কারা এই ফেনে আড়ি পাতছে?'

'জানি না।'

'তা হলে তো মুশকিল হইল।'

'আমি একটা কথা বলব?'

'কত?'

'আপনি যদি আমার সঙ্গে আগরতলার যান তা হলে কাজটা চটপট হয়ে যায়।'

'আমি ডি আই জি-র বাসায় যাইতে পারি না রিপোর্টার।'

'আপনি আমার বাসায় থাকবেন। শুনরাড়িই আমার ওখানে এসে কথা বলবেন।'

'এটা অবশ্য মন্দ না।' দশরথ ডাবছিল।

'তা হলে?'

'না রিপোর্টার। আমার যাওয়া ঠিক না।'

'আপনি তো ব্যাজেকর্ডে আগরতলায় যান।'

'তা যাই।'

'বেশ। আপনার মনে যদি সন্দেহ থাকে তা হলে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

'না না।' দ্রুত বলে উঠল দশরথ, 'টাকার ব্যাপারে বেশি সাক্ষী রাখা ঠিক না।'

'আপনি আড়াই লাখ কমিশন পাবেন, টাকার অঙ্ক কমে গেলেও আপনারটা কমছে না।'

'বলতেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। চলো। সিধাই থেকে কীভাবে যাবিবা?'

'গাড়িতে নিয়ে যাব আবার গাড়িতেই পৌঁছে দেব।'

'আজ বিকালের আগে—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

দশরথ তার লোকদের ডেকে নির্দেশ দিল। একজন কিছু বলতে যাচ্ছিল, সে তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। কী করতে হবে বা হবে না নির্দেশ দিয়ে একটা সাইকেলে উঠে বসল দশরথ। বাসুদেব সামনে যাচ্ছিল। দশরথ বলল, 'আমাদের আগে যাইতে দাও রিপোর্টার, তুমি পথ জানো না।'

দশরথ যে সিধাইতেও বেশ পরিচিত ও অভ্যস্ত তা একটু পরেই বোঝা গেল। কাগর রেখে যে পথ জনমানুষকুল ছিল আজ দিনের আলোয় তা মনে হচ্ছে না। যারাই রাস্তায় হাটছে তারাই হাত তুলে দশরথকে অভিবাদন জানাচ্ছে। এর ফলে ওদের

৬৮

একটু দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

ধানার সামনে এসে দশরথ জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার রিপোর্টার?'

'আমি গাড়িটাকে এখানে রেখে গিয়েছিলাম।'

'ঠিক করছ। রাস্তার থাকলে এখন আর পাইতা না।' দশরথ হাসল।

বাসুদেব ধানায় ঢুকতেই ও সি হতভম্ব, 'আপনি বেঁচে আছেন এখনও।'

'অজুত ভুত যে নই তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

'আপনি ফিরে এলেন কী করে?'

'গেলাম আর এলাম। আমার জাইভার কোথায়?'

বঙ্কিম এল। বাসুদেবকে দেখে একগাল হাসল। বাসুদেব বলল, 'গাড়ি চালু করো।'

'যে জন্যে গিয়েছিলেন সে কাজটা হয়েছ? ও সি জিজ্ঞাসা করলেন।'

'অর্ধেকটা। এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি ব্যক্তিটা শেষ করতে।'

'কাকে?'

'শ্রীযুক্ত দশরথ দেববর্মা।'

'করছেন কী। বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আজ্ঞাল থেকে দেখুন। সামান্যামনি হবেন না। উনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'তা হলে অর্ধেক কাজ কেন, আপনি ঠিক লোককে পেয়ে গেছেন।'

'এটা যখন জানেন তখন আপনারা কেন যে পান না। আচ্ছা, চলি।'

বঙ্কিম গাড়িটা বের করতে বাসুদেব পেছনে উঠে বসল। বঙ্কিম বলল, 'স্যার, আপনি ওখানে?'

'চুপচাপ চালাবে। পেছনে তাকাবে না। যা বলব তাই করবে।' ধমক দিল বাসুদেব।

'ঠিক আছে স্যার।'

গেটের বাইরে জিপটিকে দাঁড় করাতে দশরথ এগিয়ে এল। বাসুদেব বলল, 'পেছনে আসুন।'

উঠে বসল দশরথ, 'পেছনে কেন? বেশি বাঁকনি লাগবে না?'

সিধাই-এর রাস্তায় গাড়ি চলতে শুরু করলে বাসুদেব জিপের পেছনের ড্রিপলের ঢাকনাটা টেনে নামিয়ে দিল। দশরথ বলল, 'এ কী। বন্ধ করল্যা কেন?'

'আপনার জন্যে।'

'মানে?'

'এখানে সবাই আপনারকে চেনে। আমার সঙ্গে জিপে যাচ্ছেন, খবরটা চাউর হলে আপনার কৃতি হতে পারে। মানে, যে কাজে যাচ্ছেন।' হাসল বাসুদেব।

'রিপোর্টার, তুমি বেশ বুদ্ধিমান।' দশরথ চোখ বন্ধ করল।

মুখোমুখি দুটো সিটে ওরা বসে। নীচে টায়ারটা রাখা আছে। সামনের দুটো সিট খালি, শুধু বঙ্কিম একমুখে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। সিধাই পার হওয়ার পর বাসুদেব টায়ারের খাঁজে হাত ঢোকাল। রিভলভারের বাঁটাটাকে পেতে অসুবিধে হল না। দশরথ জিজ্ঞাসা করল, 'কী বুঝতেছ?'

রিভলভারটা তুলে সোজা লোকটার বুকের নিকে ধরল বাসুদেব, 'একদম কথা

নয়। চুপ।'

'রিপোর্টারি? তোমার মন্তব্য কী?' প্রায় চিৎকার করে উঠল দশরথ।

'অর একবার আওয়াজ করলেই গুলি চালাব শুয়েয়ের বাচ্চা।' চাপা গলায় বলল সে।

'তুমি, তুমি—।' বিভ্রান্তি করছিল দশরথ।

'নিচু হ। নিচু হয়ে টায়ারের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। শো বচ্ছি।' রিভলভার নাচাল বাসুদেব। মুখ বিকৃত করল যতটা সে করতে পারল।

জিপের দুটো সিটের মধ্যে জায়গা বেশ অল্প। কিন্তু তার মধ্যেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল দশরথ। বাসুদেব দ্রুত তার মুখে রুমাল শুঁড়ে দিয়ে গাড়ি মোহর কাপড়ে বেঁধে ফেলল মুখটাকে। তারপর সে বক্সিমকে ডাকল, 'তোমার কাছে আর কাপড় আছে?'

'আছে।' বক্সিম ডাকছিল না।

'দাও।'

বক্সিম দুটো লাল রঙের কাপড় পেছনে ফেলে দিল। একটা দিয়ে দশরথের হাত পেছনে মুড়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল সে। দ্বিতীয়টাকে চোখ বাঁধল। দশরথ গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানিয়ে বাচ্ছলি কিন্তু জিপের আওয়াজে সেটা তেমন জোয়ালা পোনাব্বিল না। আগরতলার কাছাকাছি এসে বাসুদেব বলল, 'এবার বাঁ দিকে ঘুরবে।'

বক্সিম মাথা নাড়ল।

এই খামারবাড়িটা কিনেছিলেন বাসুদেবের বাবা। অনেকটা জায়গা নিয়ে একটা টিলার ওপর বাড়ি। এককালে চাষ হত, মুরগি ছিল, গোরুও ছিল। কিন্তু আন্দোলন শুরু হওয়ার পর সেগুলো রাতবিরেতে হামলা করে নিয়ে যাওয়া শুরু হওয়ার পর এমনি ফেলে রাখা হয়েছে। একজন চৌকিদার থাকে এখানে। সে নিজে সবজি ফলায়, মুরগির চাষ করে। হাতে সময় থাকলে মাসে একবার যায় বাসুদেব। নীলা অনেকবার বলেছে, 'অন্তখানি জমি, বিক্রি করে দাও। পরে দেখবে, ওটাও জবরদখল হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু বাবার স্মৃতির কথা ভেবে বিক্রি করার ইচ্ছে হয়নি বাসুদেবের।

হর্ন দিতে চৌকিদার এসে গেট খুলল। বাসুদেব নেমে দাঁড়াল জিপ থেকে। চৌকিদার তাকে দেখে হাত জোড় করতেই বাসুদেব তার কাঁধে হাত দিল, 'ঘরলোর টিক আছে?'

'একদম ঠিক।'

'আমার সঙ্গে একজন গেস্ট আছে। যদি কেউ এখানে আসে আমাকে আগে জানাবে। আমাদের গেস্ট কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। তিনি যে এখানে আছেন তাও ফোন কেউ না জানে।'

'ঠিক আছে সাহেব।'

'বক্সিমের পাশে উঠে বসতেই সে জিপটাকে নিয়ে সোজা চলে এল টিলার ওপরে। নিচে গেটের পাশেই চৌকিদারের ঘর। টিলার ওপরে কেউ আসে না। ত্রিশলটা সরিয়ে বাসুদেব ডাকস, 'এই হারামজাদা, চটপট নেমে আয়।'

চেষ্টা করেও সোজা হয়ে বসতে পারছিল না দশরথ। দীর্ঘ সময় অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে

উপুড় হয়ে থাকায় তার শরীর সোজা হচ্ছিল না। বুঝতে পেরে সাহায্য করল বাসুদেব। ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে সোজা ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করল সে। এই বাড়িতে দুটো বেডরুম একটি বসার ঘর। এখানে কেউ সাজোরে চিৎকার করলেও কাউকে শোনাতে পারবে না। প্রথমে মুখ খুলল সে। মুখের ভেতর থেকে রুমাল বের করে নিতেই কাশি শুরু হয়ে গেল। প্রবলভাবে কাশতে লাগল দশরথ।

দরজার দৃশ্য হল। বাসুদেব দেখল বক্সিম এসে দাঁড়িয়েছে। সে গভীর গলায় হুসুম করল, 'দেখো ভো, একটা মাসে জল আনতে পার কিনা।'

বক্সিম ছুটল। এই বাড়িতে সে এর আগে বহুবার এসেছে কিন্তু এরকমভাবে কাউকে নিয়ে আসেনি। তার মালিক পুলিশের ডি আই জি ছিলেন, জামাই রিপোর্টারি। কিন্তু জামাই যে এরকম একটা কাজ করতে পারে তা তার ধারণা ছিল না। কিন্তু সে বুঝছিল এসব কাজ করতে হচ্ছে দাদাবাবুকে উদ্ধার করার জন্যে। জল এনে দিতে দশরথ কোনওমতে দু' চৌক গিলল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এসব কী ব্যাপার! আমাকে যতটা দাও কেন রিপোর্টারি?'

'এখনও কিছুই পাওনি শয়তান। এবার পাবে।'

'তুমি কী জাযায় কথা বল? ভ্যা! আমি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করি নাই।'

'কেন করবি? ভোর ছেলে সাড়ে বারো, তুই আড়াই লাখ আড়বি, খারাপ ব্যবহার কেন করবি। শোন, আমি বেশি ঝামেলা করতে চাই না, ডাক্তার কোথায় আছে?'

'ডাক্তার। আমি কী জানি। তুমি বললো টাইগারে নিচ্ছে।'

'তুই না জানলে টাকটা কামাবি কী করে?'

চুপ করে গেল দশরথ। এখনও তার চোখ এবং হাত বাঁধা।

'ভোর ছেলে কোথায়?'

'আমার ছেলে।' অস্পষ্ট গলায় বলল দশরথ।

'সে কোথায়?'

'আমি জানি না রিপোর্টারি।'

সপাটে চড় মারল বাসুদেব। মারতেই লোকটা ঘুরে মেঝের ওপর পড়ে গেল। পড়ে হাউমাউ করে কাদতে লাগল। দু' হাতে আবার বাসুদেব ওকে তুলল, 'ভোর ছেলে কোথায়?'

'বলছি ভো, আমি জানি না। সে ঘর ছাড়ছে অনেকদিন। পুলিশের ভয়ে সে আভারগাউন্ডে থাকে। তা ছাড়া আমি সি পি এম আর সে উগ্রপন্থী। তার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নাই। মুখ দেখতে চাই না তার।' দশরথ বলতে বলতে মাটিতে পুতু ফেলল।

'তা হলে টাকটা কামাতিস কী করে?'

'আমি ছাইতাম। টাইগারদের কাছে বাইতাম।'

'কোথায় গেলে তাদের দেখা পেতিস?'

'আমি জানি না।'

'আবার বেগে গেল বাসুদেব। হাত চালাল সে। কিন্তু গোজানি ছাড়া দশরথের মুখ থেকে একটি কথাও বের করা বাচ্ছলি না। সে দশরথের শার্টের পকেট দেখল। কিছুই

নেই। পাঁচঘানা দশ টাকার নোট ছাড়া। প্যাণ্টের পকেটে পরিষ্কার রুমাল আর কিছু খুঁচুরো। কোমরে হাত বোলাতে ছোট শক্ত কিছু অনুভব করে জামাটা তুলল বাসুদেব। মোবাইল ফোন। খুব ছোট। দেখলেই বোকা যায় অন্তত হাজার পঁচিশেক দাম।

‘এটা কোথেকে পেলি?’

‘কিনছি।’

‘এত টাকায় জিনিস তুই গ্রামে বসে কিনেছিস?’

‘হ্যাঁ টানা মাল। সস্তায় পাইছিলাম।’ দশরথ বলল।

মিথ্যে কথা বলছে। বাসুদেব বুঝতে পারছিল, লোকটির সর্বাসঙ্গে মিথ্যে জড়ানো। কথা, চাহনি, ভরিতেও। ডাক্তারের খবর পেতে হলে এই লোকটিকে মুখ খোলানো ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। সে গম্ভীর গলায় বলল, ‘তোমাকে কেন এখানে এনেছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।’

‘না রিপোর্টার। বুঝি নাই।’ জনহিলাম তুমি নাকি ভাল মানুষ। এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবা আমি চিন্তাও করি নাই। তোমার বাপের বদমিস আমি।’ দশরথ কাতর গলায় বলল।

‘তুমি বোঝনি?’

‘না।’

‘ডি আই জি সাহেবের ডাক্তার ছেলেকে কারা নিয়ে গেছে?’

‘তোমার মুখে টাইগারদের নাম শুনলাম।’

‘তুমি জানতে না?’

‘আমার সাথে টাইগারদের কোনও সম্পর্ক নাই।’

‘তোমার ছেলের সঙ্গে নেই?’

‘না। সে রাষ্ট্রপ্রেমী।’

এত জোরে কথাগুলো বলল দশরথ যে হেসে ফেলল বাসুদেব। সোটা লফ করে দশরথ জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি হাসতেছ রিপোর্টার?’

‘না হেসে পারলাম না। তুমি জমলে গিরে চিৎকার করে বলবে পঁচিশ লাখ টাকার বদলে তোমরা সাড়ে বারো লাখ নাও আর টাইগাররা রাজি হয়ে যাবে এরকম কথা কেউ বিশ্বাস করবে? আমি জানি তুমি তোমার ছেলেকে বলবে অস্কাটা কম্মতে। ঠিক কি না?’ বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

‘একদম ঠিক না। সে জীবিত না মৃত তাই জানি না।’

‘এখন জানবে।’

‘মানে?’

‘শোনো হে রামচন্দ্রের বাপ। এই জায়গা থেকে সবচেয়ে কাছের মানুষের বাড়ি আধমাইল দূরে। তুমি হাজার চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। তোমাকে ক’ট দেওয়ার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। তুমি শুধু তোমার ছেলের চিকানা বোলো।’

‘আমি জানি না রিপোর্টার।’

‘তুমি মিথ্যে কথা বলছ।’

‘এই একই কথা আমি পুলিশেরও বলছি। তারাও কোনও প্রমাণ পায় নাই।’

‘আমি পাব।’ বাসুদেব মোবাইল ফোনের বোতাম টিপল। ফোনবুক টিপে দেখল সেখানে কোন নামার এন্ট্রি করা নেই। কী করা যায় সে ভাবতে পারছিল না। এই লোকটাকে শুধু মারধর করে কোনও লাভ হবে না। মুখই খুলবে না দশরথ।

ওকে ঘরে রেখে সে বাইরে এল। বন্ধিম দাঁড়িয়ে আছে চূপচাপ। তাকে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘ডাক্তারদাবার খবর কিছু বলল?’

‘না।’

‘খোলাই দেব সাহেব?’

‘কোনও লাভ হবে না। কী করা যাবে?’

‘আগরতলার নিয়ে চলুন। পুলিশের হাতে পড়লে—।’

‘ছেড়ে দিতে হবে। ওর বিরুদ্ধে কোনও কিছু প্রমাণ করা যাবে না।’ বলতে বলতে ওপাশের দেওয়ালটার ওপর দৃষ্টি গেল বাসুদেবের। গোটাচারেক টিকটিকি ওত পেতে আছে। স্বাভাবিক চেহারার নয় এগুলো, আগরতলার বাড়ির দেওয়ালে বাসের দেখা যায় তাদের থেকে কিছুটা বড়। সঙ্গে সঙ্গে ডিয়েতনাম ফুঙ্কের ওপর লেখা একটা বইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। আমেরিকানরা বন্দি ডিয়েতনামীদের পেট থেকে খবর বের করার জন্যে যেসব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল তার মধ্যে অন্যতম হল টিকটিকি। প্রচণ্ড মার খেলেও ওরা মুখ ফুঁলত না, মৃত্যুভয় ওদের কাবু করতে পারেনি। কিন্তু টিকটিকির কাছে ওরা হার মানতে বাধ্য হত। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধিমকে বলল, ‘একটা বেতের মুখ বন্ধ বাল্লো জোগাড় করতে হবে। ওই ঘরে আছে কিনা দেখো।’

মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা মাঝারি সাইজের বেতের ব্যাগ নিয়ে ফিরে এল। বাসুদেব আঙুল তুলে দেখাল, ‘ওখানে প্রচুর টিকটিকি আছে। গোটাছয়েক ঘরে আনো।’

‘টিকটিকি ধরব?’ বন্ধিম হতভম্ব।

‘হ্যাঁ।’

‘যদি কামড়ে দেয়।’ বন্ধিম সাহস পাচ্ছিল না।

‘দিলে দেবে।’ বাসুদেব আর দাঁড়াল না। ঘরে ঢুকে দেখল হাত বাঁধা অবস্থায় দশরথ একটা চেয়ারে বসেছে। তাকে দেখে হাসার চেষ্টা করল, ‘রসিটা খুঁল্যা দাও রিপোর্টার।’

বাসুদেব দুটো দড়ি খুঁজে বের করে প্রথমে দশরথের প্যাণ্টের প্রান্তদুটো টাইট করে বেঁধে ফেলল। দশরথ বলল, ‘এটা কী করতেছ রিপোর্টার?’

বাসুদেব জবাব দিল না। এবার পা দুটো এক করে বেঁধে ফেলল। তারপর বেশ জোরে ধমক দিল, ‘ওঠ। উঠে দাঁড়া।’

দশরথ বলল, ‘রিপোর্টার, তুমি এটা ঠিক করতেছ না। আমি পাটি করি।’

‘পাটি করি।’ তার পাটির নেতাদের তুই পাওয়া দিস? উঠে দাঁড়া।’

দশরথ উঠল। সেই অবস্থায় তাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলল বাসুদেব। এইসময় বন্ধিম ঘরে ঢুকল। তার এক হাতে বেতের ব্যাগ অন্য হাতে লম্বা চিমটি।

বলল, 'এসেছি।'

'ওটাকে ওর সামনে রাখো।'

বেতর বাস্টাকে বন্ধিম নামিয়ে রাখল দশরথের সামনে। দশরথের চোখ ছোট হল।

'এবার ওর প্যাণ্টের বোতাম খুলে দাও। কোমরের বেল্ট খুলবে না।'

'প্যাণ্ট?' বন্ধিম অবাক হল।

'হ্যাঁ বা বলছি খটপট করো।'

বন্ধিম এগিয়ে যেতে দশরথ প্রতিবাদ করল, 'এ কী করতেছ রিপোর্টার! আমি তোমার বাপের বয়সি, আমারে বেইজ্ঞত করতেছ তুমি!'

'বন্ধিম!' ধমক দিল বাসুদেব।

বাধা দেওয়ার কোনও উপায় নেই। হাত পেছন মুড়ে বাঁধা, পা-ও। শরীরটা নড়ছে না।

'খুলেছি।' বন্ধিম মিমমিনে গলায় বলল।

'বেশ। এবার চিমটি দিয়ে একটা একটা করে তুলে ওই ফাঁক দিয়ে ভেতরে ছেড়ে দাও।'

সব্বত এবার বোধগম্য হল বন্ধিমের। সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসাহ বেড়ে গেল। চিমটি ঢুকিয়ে একটা টিকটিকি বের করল সে। বেশ বড়সড়। দশরথ তাই দেখে চিংকার করল, 'মতলবটা কী, ও রিপোর্টার!'

'চোপও।' বাসুদেব গম্ভীর গলায় বলল।

বোতামের জায়গা দিয়ে টিকটিকটাকে ছেড়ে দিল বন্ধিম। তারপর দ্বিতীয়টা, এবং বাকিগুলোকে। প্রচণ্ড চিংকার করতে লাগল দশরথ। বাসুদেব বলল, 'বোতাম অটিকে দাও।'

বোতাম অটিকে দিতেই আচমকা চূপ করে গেল দশরথ। ফেন বোকার চোঁটা করল। বাসুদেব দেখল প্যাণ্টের দুটো পায়ের মধ্যে এখন আলোড়ন চলছে। একবার গোড়ালি আর একবার হাঁটুর ওপর পর্বত। দশরথ দাঁতে দাঁত চেপে রহেছে। হঠাৎ সে চিংকার করে উঠল। একটা ভয়ংকর আওয়াজ যা শেষপর্বত গোড়ালিতে রূপান্তরিত হল। বাসুদেব লক্ষ করল ওর শরীর মাঝে মাঝেই কঁপে উঠছে। তারপর মুখ হাঁ হয়ে গেল, চোখ বড় হচ্ছে।

'বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি কথাটা বলবে?'

হাঁ মুখ আরও বড় হল, চোখ এবার ঠোলে বেরিয়ে আসতে লাগল। যে কোনও মুহূর্তে লোকটা মরে যেতে পারে। সে ক্ষণ ছুটে গিয়ে ওর প্যাণ্টের নীচের বোতাম খুলে দিতে এক এক করে টিকটিকিগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল। বন্ধিম সেগুলোকে বাসুদেব করল পরেও দশরথ স্বাভাবিক হচ্ছিল না। একটা সময় তার গলা দিয়ে অস্পষ্ট শব্দ বের হল, 'ভাল জল।'

বন্ধিম জল এনে দিতে এক চৌকের বেশি খেতে পারল না দশরথ। ধাম থেকে ওকে মুক্ত করে চেয়ারে বসানো হল। সমানে খাঁপিয়ে যাচ্ছে সে। ওই বইতে পড়েছিল বাসুদেব, ডিন মিনিটের বেশি শয্য করতে পারেনি কোনও ভিরেভেনামী।

৭৪

হয় বীকার করেছে নয় মারা গিয়েছে। টিকটিকি ঢোকানোর আগে তাদের অন্তর্বাস জোর করে খোলানো হত। কারণ টিকটিকিগুলো বেরানোর জাহাঙ্গা না পেয়ে পুরুষাঙ্গর ওপর খাঁপিয়ে পড়ত। দশরথের অন্তর্বাস খোলানো হয়নি। তা সত্ত্বেও আর এক মিনিট ওই অবস্থায় থাকলে বাঁচানো যেত না।

একটু সুস্থ হওয়ারপর বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন। আপনার ছেলে কোথায় আছে?' ইচ্ছে করেই সে আবার আপনিতো ফিরে গেল অথবা সে নিষ্ঠুরতার অভিনয় করতে পারছিল না।

দশরথ মাথা নাড়ল, জানি না।

প্রচণ্ড হতাশ হল বাসুদেব। ব্রেক ভয় দেখানোর জন্যে বলল, 'আপনার সামনের বাস্টাকে দেখুন। দেখছেন? আবার ওগুলোকে প্যাণ্টের ভেতরে ঢোকাব?'

'নাঃ।' গভীর চিংকার ছিটকে বের হল দশরথের গলা থেকে।

'তা হলে বলুন।'

মাথা নাড়ল দশরথ, 'কোথায় আছে জানি না। নব্বয় জানি।'

'নব্বয়ই বলুন।'

মনে করে করে টেলিফোন নাথায় বলল দশরথ। ওটা শুনেই সে বুঝল তারতবার্ধের নাথায় নয়। যে নাথায় দশরথের মোবাইলে টিপতেই ওটা জানাল নাথায় ভুল হয়েছে। বাসুদেব ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস আপনার এখনও গেল না। শেষ সুযোগ দিচ্ছি, ঠিকঠাক নাথায় বলুন। নইলে টিকটিকি ঢুকিয়ে মেরে ফেলব। এখানে পুঁতে রাখলে কেউ কোনওদিন জানতে পারবে না। বলুন। লাট চাপ!'

এবার মনে করার চোঁটা করল দশরথ। তারপর বলল, 'প্রথমে এইট এইট জিরো, তারপর এইট টু ওয়ান তারপর এই নব্বয়।'

বাসুদেব অবাক হয়ে গেল। প্রথমটা বাংলাদেশের, দ্বিতীয়টা সিলেটের। সে নাথায়গুলো টিপতেই ওপাশে ঝিং শুরু হল। ডিন-চারবারের পর একটি পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, 'কী ব্যাপার?' লাইনটা কেটে দিয়ে মোবাইল বন্ধ করে দিল বাসুদেব। অর্থাৎ একটু আসে যে কণ্ঠ শোনা গেল সেটি বিখ্যাত দেববর্মার। অসময়ে সে তার বাবা দশরথ দেববর্মার ফোন সেখে বিরক্ত হয়েছে। তারপরই মনে হল সে মোবাইলের লাইন কেটে দিয়েছে বলে বিখ্যাত ফোন করবে না তো। কেন তার বাবা ফোন করল তা জানতে চাইতে পারে। মোবাইলটা আবার চালু করে সে দশরথকে বলল, 'আপনার ছেলে ফোন করতে পারে। যদি করে তা হলে বলবেন, শরীর খারাপ লাগছিল বলে ফোন করেছিলেন।'

'আমি তো ফোন করি নাই রিপোর্টার।'

'আবার ঢালাকি করার চোঁটা করছ? তুমি যে এখানে আমার সঙ্গে আছ তা শুকে বলবে না। বললে আবার টিকটিকি ঢোকাব।' বাসুদেব কথা শেষ করামাত্র ঝিং শুরু হল। ডিনবার বাজার পর সে সেলফোনটা দশরথের হাতে দিল। দশরথ ওটাকে অন করে বলল, 'আ। শরীরটা ভাল নাই। তাই ভাবলাম—'। কথা থামিয়ে কিছু শুনল দশরথ। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কইলাম তো, ঠিক আছে।' তারপর

বোতাম টিপে অক্ষ করে নিল সেটা। ওর হাত থেকে সেলফোন নিয়ে বাসুদেব বলল, 'তা হলে দশরথবাবু, আপনাকে এখানেই থাকতে হচ্ছে। বতঙ্গন না আপনার ছেলের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে ততক্ষণ আপনাকে এখানে থাকতে হবে। চারবেলা খাবার খাবেন। পালাবার চেষ্টা করবেন না। করলে আবার বিপদে পড়বেন। আমার কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?'

'সে আবার কী। আমারে আটকাইয়া তোমার লাভ কী? মথুর চাইতেছিলা নিয়া দিছি।' ওর সাথে এখনই কথা কও। তবে আমি কইলে সে রাজি হইত, তোমার কথা সে মানবে না।' দশরথ মাথা নাড়ল।

'মানে কি না আমি বুঝব।'

বাইরে বেরিয়ে এল বাসুদেব। বকিম জিজ্ঞাসা করল, 'ওর ছেলের কাছে ডাক্তারদালা আছে?'

'মনে হচ্ছে। এখন কড়িকে কিছু বোলো না।'

'না সাহেব। মরে গেলেও বলব না। আমি তা হলে এখানে থেকে যাই।'

'তুমি থাকবে?'

'হ্যাঁ। বুড়োতাকে পাহারা দেব। আপনি চিন্তা করবেন না। শূণ্য বাসার একটা খবর নিয়ে দেখেন আর খাবারের জন্যে টাকা লাগবে।' বকিম বেশ উত্তেজিত।

পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে বাসুদেব বকিমের হাতে দিল, 'তোমার জিন্দার রইল। ও যদি পালায় তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, ডাক্তারকে আর ফেরত পাওয়া যাবে না।'

'আপনি নিশ্চিত থাকুন সাহেব। হ্যাঁ, আরও কয়েকটা টিকটিকি ধরতে হবে।'

'কেন? ওগুলোই থাক না।'

'না না। আপনি দেখেননি। বেশ কয়েকটার লেজ খসে গিয়েছে।'

বকিমের কথায় হেসে ফেলল বাসুদেব। সে লক্ষ করলেনি। হ্যাঁ, ছেলেবেলায় সে লক্ষ করত একটু খোঁচালেই টিকটিকির দেহ খসে যেত। খসে যাওয়া লেজগুলো কি ওর প্যাণ্টের তলায় পায়ের সঙ্গে লেগে আছে? কে জানে।

টোকারদারকে ডেকে সতর্ক করে দিল বাসুদেব। সে যেন বকিমের কথাগুলো চলে। চেনা হোক অচেনা হোক কোনও লোক যেন ওপরে না আসে। তারপর গাড়ি নিয়ে সে মোজা চলে এল আগরতলায়।

এখন মৃণুর। কিন্তু বাড়িটা যেন নিভুন্ড। গাড়ির আওয়াজ এবং তাকে নামতে সৈখ্যে প্রথমে নীলা ছুটে এল, 'আশ্চর্য! একটা খবর দেবে জে?'

'কোনও সুযোগ ছিল না।'

'আমরা ভেবে মরি। তারওপর তুমি বাবার রিভলভার নিয়ে গিয়েছ।'

স্ত্রীকে নিয়ে সে বাইরের ঘরে ঢুকে দেখতে গেল এবং ডি আই জি শুনকে রিটার্ড সংস্কৃতের মাস্টারের মতো দেখাচ্ছে। রিভলভার বের করে সামনে রাখল সে, 'দেখো নিন। আপনার একটা গুলিও খরচ হয়নি।'

'তা হলে নেওয়ার কী দরকার ছিল?'

'রামকৃষ্ণদেবের বলা থিয়েসি, ফৌস করিস, কামাঙ্গাস না। রিভলভার দেখাচ্ছেই যদি কাজ হয়ে যায় তা হলে শুনি ছোড়ার কী দরকার। আপনি স্নান করেননি?'

শান্তি এনে বাড়িয়েছিলেন, 'ভয়ে কাঁপছি সবাই। ওসব খেয়াল নেই।'

'আমার ব্যাপারে তো আর ভাবনা নেই। যান, স্নান করুন। আমারও খুব খিদে পেয়েছে। নাকি ভয়ের জন্যে বাড়িতে রান্নাই হয়নি।' বাসুদেব স্ত্রীর দিকে তাকাল।

'হয়েছে। তুমি স্নান করে এসো। গা থেকে টুকটাক গন্ধ ছাড়ছে।' নীলা একটু ঝকিয়ে কথাগুলো বলল।

স্নান সেরে ওরা যখন স্বাচ্ছে তখন বাসুদেব লেকল সৌমিত্রর স্ত্রী টেবিলে নেই।

ওর কথা জিজ্ঞাসা করতে নীলা বলল, 'মায়ের সঙ্গে পরে খাবে। খেতেই চাইছে না।'

'পি. বি. বললেন, 'কোনও খোঁজবন্দের পেলে?'

'পেয়েছি। তবে আর একটু ডেরিকেকেশন দরকার।'

শুশ্রূষাশী খাওয়া গায়ে নিয়ে তাকাতাই ফোন বাজল। নীলা উঠে কার্ডলেস রিসিভারটা অন করে জিজ্ঞাসা করল, 'কে বলছেন?' অপরপক্ষ কিছু বলল এবং তাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

'লল, টাকটা নেনে তাড়াতাড়ি জোগাড় করা হয়। আমরা এককথার মানুষ। ঠিক পাঁচ মিনিট বাসে এয়ারপোর্টের রাস্তায় একটা পুলিশের জিপে বোমা মারা হবে। খবরটা দিচ্ছি কারণ এতে বুঝবেন আমরা যা বলি তাই করি।' গভগভ করে খসে গেল নীলা।

বাসুদেব প্রায় ধৌড়ে এসে রিসিভারটা নিয়ে শংকর দপ্তকে ফোন করল, 'শংকরবাবু, একুনি অম্মারলেসে এয়ারপোর্টের রাস্তায় যত পুলিশের জিপ রাউন্ড দিচ্ছে তাদের সতর্ক করে নিন, কারণ পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হবে। না, না। কথা বলবেন না স্লিভ।' বলে লাইনটা কেটে দিল বাসুদেব।

'শংকর তোমার গলা চেনে? পি বি জিজ্ঞাসা করলেন।

'বোধহয়।'

'উত্তেজনায নিজের নাম বলতে ভুলে গেলে। অবশ্য আমার মনে হয় এটা নিছকই হুমকি। এয়ারপোর্টের রাস্তা ওয়ালে ব্রেকটেকড।' পি বি খাওয়া শুরু করলেন।

শান্তি বললেন, 'এত শাসচ্ছে যখন তখন টাকার জোগাড় না হলে নিপদ।'

'না। আমি তো বলেছি, এদের টাকা দেবেন না। ভয় দেখিয়েও যখন ওরা টাকা পাবেন না তখন এই কিডন্যাপের লাইন ছেড়ে দেবে।' বাসুদেব বলল।

নীলা মাথা নাড়ল, 'তুমি যেটা বলছ সেটা যদি সবাই অনুসরণ করে তা হলে হয়তো হবে। কিন্তু তার আগে আরও ভয় দেখাতে ওরা খুন করবে।'

সঙ্গে সঙ্গে শান্তির কাঁধা বেড়ে গেল।

এইসময় আবার ফোন বাজল। বাসুদেব রিসিভার অন করতই শংকর দপ্তর গলা শুনে গেল। উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনি খবরটা কোথায় পেলেন?'

'উড়ো কোনে হুমকি দিয়েছে একটু আগে। কেন?'

'ওরা বোমা মেরে একটা জিপ ধারেল করেছে। আপনার কাছ থেকে খবর পেয়ে

আমি হেডকোয়ার্টার্সে আনিয়ে দিয়েছিলাম অম্বারলেন্দে সবাইকে অ্যালার্ট করতে। ওরা সেটা করার আগেই—। তবে কেউ মারা যায়নি, দুজন খুব আহত হয়েছে। আমি এখনই বেরিয়ে যাবি।’

‘আমি যে এই নাথারে আছি তা কী করে বুঝলেন?’ বাসুদেব প্রশ্ন করল।

‘আপনার শ্বশুরমশাইয়ের নাথার আমার ফোনে দেখতে পেলাম। চলি।’

পি বি বললেন, ‘সর্বনাশ।’

রিসিডার অফ করে বাসুদেব বলল, ‘ধাবড়বার কিছু নেই। এখনও হাতে সময় আছে। ও হ্যাঁ, বক্তৃতির বাড়িতে একটু খবর দিতে হবে। ও কয়েকটা দিন বাইরে থাকবে।’

পি বি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় গেছে?’

‘গাবরদিতে। চৌকিদারটার অসুখ। তাই ওকে বললাম কয়েকটা দিন পাহারা দিতে।’

নীলা অবাক, ‘ও রাজি হয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘খাবা। এখানেই রাতে থাকতে চায় না যে সে ওই পাণ্ডববর্জিত বামারবাড়িতে একা থাকছে? তুমি কিছু লুকোচ্ছ না তো?’ নীলার গলায় সন্দেহ স্পষ্ট।

বাসুদেব শাণ্ডিভ দিকে তাকাল, ‘আপনার মেয়েকে একটু বুঝিয়ে বলুন, এত বেশি সন্দেহ করলে কোনও সম্পর্কই টেকমই হয় না।’

শাণ্ডিভ বললেন, ‘সত্যি তো। নীলা তোমার আজকাল খুব মুখ হয়েছে।’

বাসুদেব নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠিক ঠিক।’

নীলা বলল, ‘ঠিক আছে। পরে তোমায় মজা দেখাব।’

পি বি বললেন, ‘হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে? কী খবর পেয়েছ?’

‘সৌমিত্রকে টাইগাররাই নিয়ে গিয়েছে। ওদের সেক্রেটারি হল বিস্মজিত দেববার্মা। লোকটা আভারগ্রাউন্ডে আছে। পুলিশ যে ওর হাবিশ পাচ্ছে না তা আপনি জানেন। এই লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারলেই যে সমস্যা সমাধানের দিকে এগোবে এমন বিশ্বাস আমার আছে।’ বাসুদেব খাওয়া শেষ করল।

বিক্রাম নেওয়ার নাম করে সে অলোদা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম আসছে না। কাল রাতে মাটিতে শুয়েও সে ঘোমটা কাটাগনি। কিন্তু আজ হয়তো জাগতে হবে। একটা বিরাট খুঁকি নিতে যাচ্ছে সে। কিন্তু এটা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। এই বাড়ি থেকে পঁচিশ লাখ টাকা ঝেরিয়ে গেলে যে দুর্দশা হবে তা সে মনেতে চাইছে না। তা ছাড়া টাকাটা দিলেই তো সৌমিত্রকে পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। সে কথা দিয়েছে পি বি-কে, শেষ চেষ্টা তাকে করতেই হবে। এখন যদি খেমে যায় তা হলে আর একটা বিপদে পড়তে হবে। তার পক্ষে দশরথকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু টাকা দিলে সেটা করতেই হবে। আর ছাড়া পেলে দশরথ যে ভয়ংকর হয়ে যাবে তার জন্যে কোনও অনুমানের দরকার নেই। সে খুশি নয় যে দশরথকে মেয়ে ফেলবে। পুলিশকে বললেও কোনও লাভ হবে না। ওর বিরুদ্ধে মামলা করার মতো কোনও তথ্য পুলিশ খুঁজে পাবে না।

অতএব তাকেই যা করার করতে হবে। সবার আগে দরকার শাজাহানকে খুঁজে বের করা। ও এখন আগরতলায় আছে কিনা সন্দেহ।

চারটে নাগাদ একটু ‘মুরে আসি’ বলে বের হল বাসুদেব। কলেজপাড়ায় একটা রক্তের দোকান আছে শাজাহানের ভাই ফারুকের। সোজা চলে এল বাসুদেব সেখানে। ফারুক দোকানে ছিল। শাজাহান আর বাসুদেব একসঙ্গে দুলে পড়ত এ কথা ফারুক জানে। ওকে সেপে খাতির করল। ‘আরে, আসেন আসেন। খবর কী?’

‘এই চলে যাচ্ছে’ বাসুদেব হাসল, ‘তোমার দাদা কোথায়?’

‘দিনেমায়ে গেছে।’ ফারুক হাসল।

‘দিনেমা? কোন দিনেমা?’

‘আপনার খুঁউব দরকার? বলেন, খবর দিতেছি।’

‘খবর সেবে মানে? সে তো দিনেমা হল।’

‘এর আগে দুবার দেখেছি। দাদার তো একটাই নেশা।’ একজনকে সে পাঠিয়ে দিল শাজাহানের খোঁজে। তারপর চা অনাল।

‘শুনছেন?’

‘কী?’

‘পুলিশের জিশে বোমা পড়ছে। এই ব্যাপারটা আগরতলার শুক হইয়া গেল।’

‘সেটা বলা যায় না। বিস্মিত খটনাও হতে পারে।’

‘আপনি খবরটা রেডিওয়ে টিভিতে দিবেন না?’

‘দেখি।’ চা খাওয়া শেষ হতেই শাজাহান চলে এল একগাল পান মুখে নিয়ে,

‘আরে বাসুদেব! কী খবর?’

‘জরুরি কথা আছে।’

‘বলা।’

‘একটু—।’ বলামাত্র শাজাহান ওকে নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে এল। বাসুদেব বলল, ‘আমাকে বাংলাদেশ যেতে হবে। আজই। তুই ব্যবস্থা করে দে।’

ভোর হওয়ার আগেই যতটা দ্রুত যাওয়া যায় ততটা দ্রুত হেঁটে যারা সৌমিত্রকে নিয়ে একটা পাহাড়ি পথে চলে এল তাদের প্রত্যেকের মুখ ওর কাছে নতুন। জেস্টার দলে নেই। তার শিখে দেওয়া ওখুণ্ডলো কখন পাওয়া যাবে, অদৌ যাবে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। সে বলল, ‘একটু জল খাব। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।’

‘একটু দাঁড়ান। জল খাওয়া।’ একজন যুবক যে তার পাশে ছিল জবাব দিল।

‘তুমি তো ভাই অনানের মতো কথা বলছ না?’ সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল।

‘মাতৃভাষা বলতে পারব না কেন? তবে আমি যেমন আপনার বাংলা জানি তেমনই অহমিয়া, নেপালিও বলতে পারি।’ ছেলটি হাসল।

ওরা এখন পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে ঘন জঙ্গলের আড়াল।

‘মনে হচ্ছে তুমি পড়াশুনা করছ। চাকরি করনি কেন?’

‘চারকির মানে পরের গোলামি। সেটা করতে হলে স্বাধীন দেশের গোলাম হবে।’
‘তার মানে? ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নয়?’

‘আপনাদের জন্যে স্বাধীন। আমাদের জন্যে নয়। ভারতবর্ষ ভয় দেখিয়ে আমাদের প্রাণের হাত থেকে দেশটাকে নিয়ে নিয়েছে। পাকিস্তানিরা আপনাদের ডাকিয়ে দিয়েছিল আর ভারত সরকার আপনাদের আমাদের বুকের ওপর জোর করে বসিয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরাকে স্বাধীন না করা পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব।’
হেলোটি বলল।

‘কিন্তু তোমরা কী করে তা পারবে? ভারতীয় মিলিটারির সঙ্গে লড়াই করতে পারবে তোমরা? ওদের অস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে?’

‘পারব। আর তার জন্যে টাকা দরকার। যেমন করে আলফা বোরোয়া অস্ত্র কিনছে আমরাও কিনব। এই সেবুনা। এটার নাম এ কে ফিলটি বো। কী হালকা। অথচ দারুণ অস্ত্র। আপনাদের পুলিশ এসব জিনিস চোখেও দেখেনি। আপনার বিনিময়ে আমরা যে টাকা পাব তা দিয়ে কত অস্ত্র কেনা যাবে ভাবুন তো!’
হেলোটি বেশ উত্তেজিত। তার সঙ্গীরা ইশারা করল বেশি কথা না বলতে। ইশারা দেখে সে চট করে সরে গেল সৌমিত্রের পাশ থেকে।

যেন কোনও সংকেতের জন্যে ওরা অপেক্ষা করছিল। অস্ত্রত এক পাখির ভাক শুক হতেই ওরা হটিতে লাগল। শেষপর্যন্ত পাহাড়ি পথ ভিড়িয়ে একটা বরনার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। হেলোটি বলল, ‘মিন, যত ইচ্ছে জল খান।’

এসব পাহাড়ি বরনার জল খাওয়া খুব বিপদজনক। জড়িসি তো হাতেই পারে, বিকোলাই হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তাকে জল না খেতে দেখে হেলোটি বলল, ‘কী হল? বরনার জল, খান।’

‘নাঃ! ডিউবওয়ালের জল পেলো খাব।’

‘ও হো। আপনি ডাক্তার, মনে ছিল না।’

শেষপর্যন্ত ওরা পাহাড়ের খাঁজে এক অহাটী আন্তনায় এসে পৌঁছোল। আন্তনামি অহাটী বোঝা গেল তার কারণ মাথার ওপর চিমের ছাদ, দুপাশে ত্রিগল, নামনেটা খোলা, পর পর চারখানা ঘরের মতো মাথা গোঁজার জায়গা। সবচেয়ে বোটা বড় সেখানে তাকে ওঠানো হল। তারপর একজন এসে একটা শেকলের মুখের রিং চাবি দিয়ে খুলে সৌমিত্রর পায়ে পরিয়ে দিল। শেকলের অন্য প্রান্তটা একটা হকের সঙ্গে আটকানো। হকটা পাখরের মধ্যে ঢোকানো। টেনেও খোলা সম্ভব নয়। সৌমিত্র প্রতিবাদ করল, ‘এ কী ব্যাপার? হঠাৎ আমার পায়ে শিকল কেন?’

হেলোটি বলল, ‘এখানে পাহারা সেওয়ার মতো লোক কম। বেশি লোক তো এখানে নিয়ে আসা যায় না। আপনার হাত বাঁধা হচ্ছে না। যখন পেছাপ পাঁচখানা করবেন তখন বললে আমরা শেকল ধরে নিয়ে যাব।’

‘যেভাবে কুদুরকে নিয়ে যাব?’

‘যেভাবে বলিদের নিয়ে যাওয়া হয়।’ হেলোটি বলল।

‘আমার খিদে লেগেছে।’

‘পাবেন।’

‘তোমার খিদে পায়নি?’

‘আপনাকে তো বলেছি দেশের অন্য খিদে তেঁরাকে আমল দিই না।’

‘সাবাস।’

‘ঠাট্টা করছেন? আপনাদের সুভাষ বোস, ভগৎ সিং করেননি? ক্ষুরিয়ার, সূর্য সেন করেননি? তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ঠাট্টা করতে পারতেন।’

হতভম্ব হয়ে গেল সৌমিত্র। বলল, ‘তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওঁদের তুমি বেশ শ্রদ্ধা কর। ওঁদের সম্পর্কে জান।’

‘নিশ্চয়ই করি। আমি যে গুয়েভারাকে শ্রদ্ধা করি, মাও সে তুং, হো চি মিনকে করি। এঁরা সবাই দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করি, আমরাও পারব।’ কথাগুলো বলে হেলোটি চলে গেল। শরীরে ক্লান্তি প্রচুর তবু হাঁ হয়ে বসে রইল সৌমিত্র। এই হেলোটি যে বিশ্বাস নিয়ে টাইগারের সদস্য হয়েছে সেই বিশ্বাসের কথা সে আগেরতলায় বসে জানত না। এরা উগ্রপন্থী, ভারতবর্ষকে টুকরো করতে চায়, এটাই তার ধারণা ছিল। কিন্তু জঙ্গলে জঙ্গলে রোড বড় জল মাথায় করে প্রচণ্ড কষ্ট মনে নিয়ে যারা দিনের পর দিন পড়ে আছে একটি শপথ নিয়ে, তাদের আদর্শের কথা কখনওই প্রচারিত হয়নি। হয়তো এই আদর্শ ভুল, এদের ভুল পথে চালানো হচ্ছে। কিন্তু এই হেলোটি যেভাবে চে গুয়েভারায় যা হো চি মিনের সঙ্গে ক্ষুরিয়ারের নাম উচ্চারণ করে গেলে তাতে একে কী করে উপেক্ষা করে যায়।

গোনাগুনতি চারজন। যাকি তিনজনকে কণ্ঠা বলতে দেখেনি সে। যা বলার বলছে হেলোটি। সে ফিরে এল জল আর রুটি তরকারি নিয়ে।

‘কী আশ্চর্য! এখানে রুটি গেলে কোথায়?’

‘ক্যাম্প থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।’

‘ক্যাম্প?’

‘সেটা আপনার না জানলেও চলবে।’

‘তোমার নাম কী ভাই?’

‘সৌমিত্র।’

‘অর্থাৎ তুমি তোমার নাম বলবে না।’

‘স্বাধীনতা পেলে নিশ্চয়ই বলব।’

‘তোমার বাড়ির লোকজন, তোমার মা—?’

‘জগদুমি আমার মা। সেই মা যখন বন্দিরা তখন আমি আর কোনও সম্পর্কের বাঁধনে থাকতে রাজি নই। শেষে দিন।’

ক্লটিগুলো প্রায় চামড়ার পর্যায়ে চলে গেছে। টেনেও হেঁচা মুশকিল। হেলোটি সেটা লুক করে বলল, ‘দেখছি, রাতে ভাত পাওয়া যায় কিনা। ক্যাম্পে নিশ্চয়ই ভাত হয়, তবে অনেকটা দুর্গে।’

‘আচ্ছা, বলো তো, আমি কী অন্যায় করেছি?’ সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল।

‘জগদুমি আপনি বাঙালি আর আপনার টাকা আছে।’



‘অম্বার চেয়ে অনেকগুণ বেশি টাকা মাড়োয়ারীদের আছে।’

‘তারাও আমাদের দিচ্ছে। আপনারদের মতো তারা নয়। জোর করতে হচ্ছে না।’

সৌমিত্র হতবাক। আগরতকার মাড়োয়ারি ব্যবসাদাররা কখনওই স্বীকার করবেন না যে তাঁরা গোপনে উৎপাদীদের টাকা দিচ্ছেন। অবশ্য একজন ধনী ব্যবসাদার নির্বাচনের আগে কংগ্রেসকে যেমন টাকা দেন সি পি এমকেও দিয়ে থাকেন। এদের ক্ষেত্রে না বলার তো কোনও কারণ নেই।

খাওয়া শেষ হল। সৌমিত্র বলল, ‘আমি রান করতে চাই।’

‘অসম্ভব। এখানে জল নেই। জল অনেক দূরে।’

‘আশ্চর্য! আমার জন্য তোমরা পঁচিশ লাখ টাকা পাবে আর আমাদের মাত্র একবার রান করতে দেবে না? আমার লবীর থেকে গন্ধ বের হচ্ছে।’

‘আপনি জামাপ্যাট খুলে ফেলুন না। ওগুলো পরে থাকার তো কোনও দরকার নেই। খুলে দিন, আমি ওগুলোকে খুঁয়ে আনার ব্যবস্থা করছি।’ ছেলেরটি হাসল।

সৌমিত্র আর দ্বিধা করল না। শাট খুলল। প্যাট খুলতেই দেখা গেল সেটি জেনের কারণে শরীরমুক্ত হচ্ছে না। ছেলেরটি চাবি ঘুরিয়ে রিং খুলে সেওয়ার পর প্যাট বেরিয়ে এল। আবার রিং পরিয়ে দিল ছেলেরটি। এখন একটিমাত্র অন্তর্বাস পাবে বসে আছে সৌমিত্র। এভাবে থাকার কথা সে কল্পনা করেনি কখনও। কিন্তু টোকা গছটা আর নাকে লাগছে না।

ছেলেটা চলে গেল জামাপ্যাট নিয়ে। এখন সমস্ত শরীরে হাওয়া লাগছে। সে ভাবল, সীতারুদ্রা তো ছাড়িয়া পরেই থাকে। স্টার টিভিতে বে-ওয়ার্ড নামে একটা নিরীহাল হত যেকোন মেয়েরা বিকিনি আর ছেলেরা প্রায় ছাড়িয়া পরে রোল পড়ত। এই পাহাড়ি জঙ্গলে পরিবেশে কে তাকে দেখতে আসছে যে সে স্টার টিভি হলে। টাইগারদের দলে মেয়েরা আছে কিনা সৌমিত্র জানে না তবে তাদের কাজকে সে এখন পর্যন্ত দেখেনি। এক, যে মহিলা তাকে খাবার দিতে আসত সেই মহিলা যদি টাইগার না হয়।

খুঁসিয়ে পড়েছিল সৌমিত্র। যখন যখন ভাতল তখন সূর্যদেব বিদায় নিতে চলেছেন। সে দেখতে গেল খানিকটা তফাতে দুজন পাহারাদার গালে হাত রেখে দাঁড়া খেলেছে। কাগজের বোর্ড, প্লাস্টিকের ঘুটি। ওরা তাকে লক্ষ্যই করছে না, কারখানা এমন, চেনে বাঁধা আছে, পালানো কোথায়?

সঙ্গে এল। এবং তখনই সেই ছেলেরটি ফিরে এল। ওর হাতে দুটো বড় ডিফিন ক্যারিয়ার। বলল, ‘আলো ছালা যাবে না। চটপট রাতের খাবার খেয়ে নিন।’

একটা ডিফিন ক্যারিয়ার সে অন্য দুজনকে দিয়ে দিতেই তারা দাঁড়া ভুলে যেতে বসে গেল। দ্বিতীয়টা সৌমিত্রর সঙ্গে ভাগ করে নিল ছেলেরটি। ভাত আর ডিমের ফোলা মোলের পরিমাণ প্রায়।

গোতে গিয়েও খেয়ে গেল সৌমিত্র। ছেলেরটি তার ভাতের চূড়োর ডিমটাকে রেখেছে। তারপর কোল চালল। নীচ থেকে সেই নেমে আসা কোল দিয়ে ভাত মাখল ছেলেরটি। দক্ষ হাতে কোল দিয়ে প্রায় পুরো ভাত খাওয়ার পর ডিমটাকে

মুখে পুরে দিয়ে সে চোখ বন্ধ করে চিবোতে লাগল। মনে হচ্ছিল, পরম তৃপ্তি পাচ্ছে সে। অতএব খাওয়া শুরু করল সৌমিত্র। খাওয়ার পর জল খেতেই মনে হল প্রকৃতি ডাকছে। সে কথাটা বলতেই ছেলেরটি হকের কাছে নিয়ে গিয়ে চাবি দিয়ে শেকল খুলে তাকে নিয়ে গেল জঙ্গলে। যেভাবে কুকুরকে শৌখিন বাবুয়া পার্কে বা রাস্তার মলনিয়োগ করার ঠিক তেমনিই চেন ধরে রইল সে।

হালকা হয়ে ফিরে এসে সৌমিত্র বলল, ‘তোমার স্বপ্ন যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন অবশ্যই আজকের কথাটা বলবে। আমার কথা।’

সঙ্গে নামলেই সব অস্বকার। ওরা শোওয়ার ব্যবস্থা করছিল। ছেলেরটি তার পাশে শুয়ে পড়ল। শোওয়ার আগে সৌমিত্র বলল, ‘তোমাকে একটা কথা বলব।’

‘নিশ্চয়ই। মজুন।’

‘তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়ছ, কিন্তু লড়বে কী করে?’

‘কেন?’

‘তার আগেই তো ম্যালেরিয়া মরবে। জঙ্গলের মধ্যে এককম খোলা ঘরে শুতে পাহাড়ি মশা কামড়াবে। নির্ধাত ম্যালেরিয়া।’

‘আপনার পায়ের কাছে মোটা চাদর আছে। টেনে নিয়ে মুড়ি দিয়ে শুতে পড়ুন, মশা ছল ফোটাতে পারবে না।’ ছেলেরটি বলল।

‘গরম হবে না?’

‘না। এখানে একটু রাত হলেই ঠান্ডা পড়ে।’

‘এটা কোন জায়গা? অবশ্য বলতে আপত্তি থাকলে বোলা না।’

‘আপনি যেহেতু বুঝ পোঁতাংলি নিয়েছেন তাই বলতে আপত্তি নেই। আমরা এখন বাংলাদেশে আছি।’

‘কী বললে? সত্যি? আমরা বাংলাদেশে আছি?’

‘হ্যাঁ।’

‘পানপোর্ট ভিসা ছাড়াই বাংলাদেশ?’

‘ওসব নেই বলে রাতে আলো ছালা নিষেধ।’

কখন কেমন করে বাংলাদেশে ঢুক গিয়েছে তা নিশ্চয়ই জানে না সে। ওরা মাঝে মাঝেই সতর্ক হত, অশেখা করে তবে এগোত। আন্তর্জাতিক সীমারেখা পার হওয়ার সময় সেরকমই কিছু করেছিল হয়তো যা সে টের পায়নি। কিন্তু বাংলাদেশে এসে কি ওরা নিরাপদ? বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্ক খুব ভাল। বাংলাদেশের মানুষ কখনওই এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করবে না। তা হলে এখানে ওরা অস্থায়ী ক্যাম্প করল কী করে? ছেলেরটির কথা ঠিক হলে কাছাকাছি কোথাও বড় ক্যাম্প আছে ওদের।

সৌমিত্র অসাড় হয়ে গেল। ওকে ওরা ভারতবর্ষের বাইরে নিয়ে এসেছে যখন তখন আর কোনও পর্যন্ত খোলা নেই। একটু আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল বাসুদেব তার মুক্তির জন্যে কিছু করবে। ছেলেরটির মুখে বাসুদেবের কথা শোনা। পর তার আশা হরেনি পুছোর আগেই সে আগরতলার ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু এই বাংলাদেশে বাসুদেবের কোনও কমডা নেই।

Hasan

সৌমিত্র মনে মনে খুবই মুগ্ধে পড়ল।

‘শুয়ে পড়ুন।’ ছেলেটি বলল।

‘কেন? মাকরাতে উঠে আবার হাঁটতে হবে নাকি?’ সৌমিত্র জানতে চাইল।

‘না। আপনাকে আর হাঁটতে হবে না। কাল যত বেলা পর্যন্ত ইচ্ছে যুমাতে পারেন। কিন্তু এখন আর কথা বলবেন না।’ ছেলেটি বলল।

‘তুমি কখনও কলকাতায় গিয়েছ?’

‘না।’

‘গেলে দেখতে, কলকাতা সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের জন্যে।’ সৌমিত্র বলল।

‘তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে?’

‘ভারতবর্ষের মানুষ দেশের যে কোনও জায়গায় গিয়ে মিলেমিশে থাকতে পারে। তোমাদের অনেকেই এখন কলকাতা-বোম্বাই-মিল্লিতে বাড়িঘর করে আছেন। শুধু ত্রিপুরার মানুষ না ভেবে যদি নিজেকে ভারতবর্ষের মানুষ বলে ভাব দেখবে আর কোনও সমস্যা থাকবেই না।’ সৌমিত্র বলল।

‘অন্ধমেরা সবসময় একটা অজুহাত আঁকড়ে ধরে। কলকাতার মানুষদের মেরুপুণ্ড নেই, আদর্শ বলে কিছু নেই। তারা তাদের জন্মভূমিকে মা বলে ভাবতেই পারে না। যে যেমনভাবে পারছে তাদের জায়গায় গিয়ে ভোগ করছে। আশ্চর্য, কলকাতার সবচেয়ে ধনী লোক কি বাড়ি?’ ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল।

‘না।’

‘তা হলে? যান না মনিপুরে, মেঘালয়ে, অরুণাচলে। গিয়ে বলুন এটা ভারতবর্ষ, এখানে বাড়িঘর করে থাকব। থাকতে পারবেন? ওই তো, নেপালিরা আন্দোলন করল দার্জিলিং ওদের দেশ, ওদের চাই। বাড়ালি সরকার ভয়ে ভয়ে দিয়ে দিল। দেয়নি?’

‘তুমি ভুল করছ। গোষ্ঠীল্যভ ওরা পায়নি। ওদের স্বায়ত্বশাসন নেওয়া হয়েছে।’

‘তার মানে সুভাষ খিসিং একজন মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। তাই বলছেন?’

‘না, তাও নয়, তবে—’

‘তিনি যা বলবেন সেখানে তাই আইন। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকেও তিনি পাক্তা দেন না। আসলে আপনারা, বাড়ালিরা এত সুবিধেভোগী জাত যে যেখানে পেয়েছেন ঢুকে গিয়েছেন। পাকিস্তানিদের ভয়ে চলে গেছেন আসাম, ত্রিপুরা। গিয়ে বলছেন এটা ভারতবর্ষ, আমার দেশ। আরে পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত যে ছিল পাকিস্তানের নাগরিক সে স্বাভাবিক ভারতীয় হয়ে যায় কী করে? আপনারা যদি ত্রিপুরা ছেড়ে চ’ল না যান তা হলে রক্ত ঝরবেই। আর একবার রক্ত ঝরতে যদি দেখে তা হলে বাড়ালিরা সবার আগে ভয়ে পালাবে।’ ছেলেটি গুয়ে পড়ল। চান্দর টেনে নিল শরীরে।

সৌমিত্র তবাক হয়ে শুনছিল ওর কথা। ও কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাগুলো বলল না কেউ ওকে শিখিয়েছে? আবার ওর কথা যে পুরোটাই মিথ্যা

এমনি ভাবার কোনও কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে ভারতবর্ষের কথা ভেবেছিলেন, কলকাতা তার প্রতীক। কিন্তু বাসুদেবের কাছে সে শুনেছে কলকাতার অনেক বাড়িওয়ালাই ভাড়াটে হিসেবে অব্যাহতি পছন্দ করে। কলকাতার এখন বাড়ালি এবং অব্যাহতির সংখ্যা কত? কিন্তু সেটা যাই হোক, এই ছেলেটিকে আর অশিক্ষিত বলা যাচ্ছে না। এটা টাইগার দলের ওপরতলার নেতাও নয়। এখানেও তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছে, পাহারায় আছে। অথচ ওর ধারণা ওর কাছে পরিকার। জলে জপলে প্রচণ্ড কষ্ট করছে যে তার স্বপ্ন স্বাধীন ত্রিপুরার মাটিতে দাঁড়ানো। এদের সংখ্যা যদি ক্রমশ বেড়ে যায় তা হলে কোনও মিলিটারির পক্ষে দমন করা সম্ভব নয়। সরকারের একমাত্র স্বস্তির কারণ হল এদের নেতারা। নিজেদের বার্থ বজায় রাখার জন্যে-ওরা আন্দোলনের বারোটা বাড়িয়ে দিতে পারে যে কোনওদিন। অস্ত্র কেনার নামে যে টাকার ব্যবস্থা হচ্ছে তার হিসেব তো কখনওই কাউকে দিতে হয় না।

শুয়ে পড়ল সৌমিত্র। তার জামাপ্যান্ট এখনও ফেরত পায়নি। দিবা গোটা দিন শুধু বাড়িয়া পরে কাটিয়ে দিল সে। নিজেকে এই পরিবেশে স্বাধীনতা আদম মানব বলে মনে হচ্ছে। সে চান্দরা গায়ে টেনে নিল। আগরতলার বাড়িতে কী হচ্ছে এখন? ওরা নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে টাকার জোগাড় করছে। সময়সীমা পেরিয়ে গেলে এরা কি তাকে খুন করবে? আশ্চর্য যদি সেরকম সিদ্ধান্ত হয় আর নেতারা যদি এই ছেলেটিকে আদেশ দেয় তাকে মেরে ফেলতে এ কী করবে? সৌমিত্র নিশ্চিত যে ছেলেটি ভাবলে আদেশ পালন করা মানেই দেশমায়ের সেবা করা। তার বুক থেকে মোচড়ানো বাতাস বেরিয়ে এল।

কিন্তু বাসুদেব কী করছে? সে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? যতটুকু তাকে সে চেনে এরকম হওয়ার কথা নয়। বাসুদেব রগচটা, গৌয়ার। জ্বরের বশে সে যে কাজ করতে পারে তা অন্য কেউ করতে সাহস পাবে না। বিদেশি কোম্পানি তাকে এমনি এমনি পূর্বাঞ্চলের মুখ্য প্রতিনিধি করেনি। কিন্তু এটা যদি বাংলাদেশ হয় তা হলে বাসুদেবের পক্ষে সেটা অনেক দূর। এখানে তার পক্ষে পৌঁছানো কি সম্ভব?

ভাইয়ের ব্যবসায় শাজাহান কতটা জড়িত তা বাসুদেব জানে না। কিন্তু তার কাছে খবর ছিল বাংলাদেশে ওর অনায়াস যাতায়াত আছে। সে খবর নিয়েছিল, শাজাহান কোনও চোরচালানোর মধ্যে নেই। তার কাজ হল দু’দেশের মানুষদের বৈধািনিতাবে সীমান্ত পেরোতে সাহায্য করা। এটা ঠিকঠাক করার জন্যে যে নেটওয়ার্ক সরকার তা শাজাহানের আছে।

বাসুদেব বুকেছিল তাকে বাংলাদেশে যদি বৈধ পথে যেতে হয় তা হলে অনেক সময় লেগে যাবে। ভিসার ব্যবস্থা, প্লেনের টিকিট ইত্যাদিতে সময় চলে যাবে অনেক। অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঢোকার সুবিধা বিস্তর কিন্তু এখন এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।

শাজাহান গ্রন্থাবলী শোনার পর বলেছিল, 'দাখ বাসু, যেসব লোকের নামের পাশে এ বি সি ডি নেই তাদের নিয়ে কোনও সমস্যা হয় না। এপারের লোক ওপারের গেলেও কেউ চট করে বুঝতে পারে না। কিন্তু তুই হলি নামকরা রিপোর্টার। যে-কোনও মুহুর্তে তুই ধরা পড়ে যাবি।'

'আমাকে বুক্টিটা নিতেই হবে।'

'কী এমন দরকার?'

'একটা খবরের সন্ধানে যাচ্ছি।' বাসুদেব বলল।

'তুই ঠিক কোথায় যেতে চাস?'

'আখাউরা রেলওয়ে স্টেশনে।'

'বাংলাদেশের টাকা সঙ্গে আছে?'

'না। যোগাড় করতে হবে।'

'ঠিক আছে। এখন রাতে বার্ডার পার হওয়া বেশ কামেলার ব্যাপার। বি এস এক আর বি ডি আর খুব অ্যালাট থাকে। গুলি চালায়। সবচেয়ে ভাল সময় ভোরবেলা। তুই রেডি হয়ে ঠিক একটার সময় এখানে চলে আস। দুটোর আগে রওনা হব।' শাজাহান বলল।

'তুই অত রাতে ওই দিকে যাবি কী করে?'

'উগ্রপন্থী? হাঙ্গল শাজাহান, 'আমাকে ওরা কিছু বলে না।'

'কেন?'

'আমার কাছ থেকে ওরা উপকার পায়। তা ছাড়া আমি মুসলমান, তাদের মতো হিন্দু বাড়ালি নই।' হাঙ্গল শাজাহান, 'এ নিয়ে তুই কিছু ভাবিস না। তুই আমার বন্ধু, দাখিৎ খনন নিয়েছি তখন তুই নিরাপদ।'

'তোরা চার্জ কত?'

'তুই যিরে আয় তারপর কথা হবে। আর হ্যাঁ, কত টাকা নিয়ে যাবি?'

'হাজার দশেক।'

'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়াস টাকার রেট যাই হোক না কেন আমার কাছে নিলে সমান সমান।'

মাথা নেড়ে চলে এসেছিল বাসুদেব।

নীলাকে বলবে কি না হির করতে পারছিল না সে। শেষপর্যন্ত ওকে জানাল, 'শোনো আজই কলকাতায় যেতে হচ্ছে। দুদিন বাদে ফিরব।'

'সে কী? এদিকে এই অবস্থা—' নীলার গলা টেলিফোনেই অসহায় শোনা।

'এ ব্যাপারেই যাচ্ছি। কলকাতায় ওদের সোর্স আছে। ডুমি চিন্তা করো না।'

'কলকাতায় গেলে চিন্তা করব কেন?'

'ওড।'

এসময় কলকাতায় যাওয়ার কোনও ফ্লাইট নেই। অঞ্চ নীলা সেটা একবারও ভাবল না। মাঝে মাঝে বুদ্ধিমতীরাও কীরকম হয়ে যায়। আর হয় বলেই যাঁচোয়া।

ডায়েরি দেখল বাসুদেব। দুটো নাম। আকবর হাফিজ সোনা আর আসরাফুল হক বাবল। এই দুটো মানুষ এখন ঢাকার বেশ সম্মানজনক ব্যক্তি। এঁরা

এসেছিলেন প্রায় তিরিশ বছর আগে। মুক্তিযুদ্ধের সময়। দুজনেই বাসুদেবের বাড়িতে আজায় নিয়েছিলেন সেইসময়। তখন ওর বয়স বড়জোর পাঁচ। বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের গরু সে পরে বড় হয়ে শুনেছে। একজন খুদিরাম বা সূর্য সেন নয়, হাজার হাজার খুদিরাম বা সূর্য সেন তখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে খান সেনাদের বিরুদ্ধে। লড়ে জিতেছে। সেইসময় অনেকেই চলে এসেছিলেন শীমান্তের এপারে। এখান থেকেই গুরু হয়েছিল তাঁদের মুক্তিযুদ্ধ। বাসুদেবের বাবা এই যুদ্ধের সমর্থক ছিলেন বলে সোনচাচা আর বাদলচাচা এ বাড়িতে ছিলেন প্রায় দুই মাস। যুদ্ধের পরেও সেই সম্পর্ক শেষ হয়নি। দু-তিন বছর অন্তর ওঁরা এসে বাবার সঙ্গে দেখা করে যেতেন। শেষ এসেছিলেন বছর দশেক আগে। ওঁরা যখনই আসতেন তখন একসঙ্গে আসতেন। বাবা যখন চাকরির সূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে পোস্টেড ছিলেন তখনও এ বাড়িতে আসতে ওঁরা অস্বাভাব্য বোধ করতেন না। চবিশ বছরের তরুণ বাসুদেবের সঙ্গে ওঁদের ভাব হয়ে গিয়েছিল খুব। পরবর্তীকালে চিত্রিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছে। বাসুদেবের বাবার মৃত্যুর পর আর ওঁরা আসেননি। তবে বাসুদেব শুনেছে বাদলচাচা বাংলাদেশের রাজনীতিতে খুব গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। তার ধারণা একবার গিড়ে ওঁদের কাছে পৌঁছোতে পারলে সাহায্য পাওয়া যাবেই।

অত রাতে আগরতলায় আজকাল অটো দুয়ের কথা রিকশাও পাওয়া যায় না। দশ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে হেঁটে যাওয়া তো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অন্য কোনও উপায় নেই। বারোটা নাগাদ টেলিফোন এল শাজাহানের, 'তোকে আসতে হবে না, আমি যাচ্ছি।'

স্বস্তি পেলে বাসুদেব। অ্যানসারিং মেশিনে একটা মেসেজ এসেছে। বোতাম টিপতেই সে রিহাং-এর কণ্ঠস্বর শুনল, 'রিপোর্টার, ডুমি কাল রাতে এসরাইবাজারে দশরথ দেববর্মার বাসায় ছিল। তারে নিয়া আজ সকালে আগরতলায় আসছ। কিন্তু দশরথ দেববর্মার কোনও খবর তার বাসার লোক পাইতেছে না। সে এখনও এসরাইবাজারে ফেরে নাই। সে কোথায় নিশ্চয়ই ডুমি জানে। দশরথকে ফিরত চাই রিপোর্টার।' মেসেজের আসান সময় বিকেল পাঁচটা। অর্থাৎ লোকটাকে ওর গ্রাম থেকে নিয়ে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টাইগারদের কর্তারা জেনে গেছে। টেলিফোনেটা সে যদি খরত তা হলে বলত, দশরথ কাজ শেষ করে দুপুরে বেরিয়ে গেছে। আর জানতে চাইত, একজন সি পি এম গ্রামপঞ্চায়েতের নেতার জন্মে তারা এত উদ্বিগ্ন কেন? দশরথ তো টাইগারদের দলে নেই।

কিন্তু ওরা চুপ করে থাকবে না। আবার ফোন করবে। এবং তখনও তাকে না পেলে সন্দেহ বেড়ে যাবে। বাসুদেব অ্যানসারিং মেশিনে রেকর্ড করল, 'আমি জরুরি কাজে কলকাতায় যাচ্ছি। মিন তিনেক পরে ফিরব।' আপনাব যদি জরুরি কিছু জানানোর থাকে তা হলে বিপ শব্দটি শোনার পর বললে রেকর্ড হয়ে থাকবে।'

ঠিক দুটোর সময় শাজাহান এল। সে একটা জিপ নিয়ে এসেছে। বাইরের ঘরে ঢুকে বলল, 'দেখ বাসু, আমি চাই না তোমার কোনও বিপদ হোক। তোমার কি না গেলেই নয়? আমি চাইছি তুই—।'

'না শাজাহান। আমাকে যেতেই হবে।' বাসুদেব বলল।

'বেশ। তুই আখাউরা থেকে কোথায় যাবি?'

'ঢাকায়।'

'যখন টিকিট কাটবি তখনই তো কাউটারের লোক তোকে সন্দেহ করবে।'

'কেন?'

'ওরা বুঝতে পারে কে বাংলাদেশের মানুষ, কে নয়।'

'কিন্তু আমার যে কালকেই ঢাকায় পৌঁছানো দরকার।'

'শোন। আখাউরা স্টেশনের বাইরে সন্ধ্যাউদ্দিনের খাবার দোকান আছে। তাকে আমার কথা বলবি। টাকা দিলে সে তোমার টিকিট কেটে দেবে।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল শাজাহান, 'এটা রাখ।'

বাসুদেব দেখল কার্ডটা শাজাহানের। তলায় লেখা 'আপনাদের সেবক।'

'তুই আমার সঙ্গে আখাউরা পর্যন্ত যেতে পারবি না?'

'না। একটা বড় পাটি আসবে পরন্তু। ওদের নিয়ে আজমীর যেতে হবে।'

'কোথেকে আসছে?'

'তুই যেভাবে বাংলাদেশে যাচ্ছিল ওরা সেভাবেই আসছে। আসছে তীর্থ করতে, অন্য উদ্দেশ্যে নয়।'

'ধরা পড়লে কী হবে?'

'ইন্ডিয়ান ভেতরে ঢুকে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। যারা নেহাতই বোকা তারাও ধরা পড়ে। যাক গে, ওঠ, রওনা হওয়া যাক।' শাজাহান উঠে দাঁড়াল।

'তুই বর্ডার অবধি যাবি?'

'হ্যাঁ। টাকা নিবি তো?'

বাসুদেব একশো টাকার বাতিলে দশ হাজার শাজাহানকে দিল। এই টাকা হঠাৎ কোনও বিপদআপদের জন্যে তোলা থাকে বাড়িতে। বাংলাদেশের টাকায় দশ হাজারের বাতিলটা এগিয়ে দিয়ে শাজাহান বলল, 'হাজারদুয়েক পকেটে রাখ। বাকিটা এমন জায়গায় লুকা যেন কেউ বুঝতে না পারে।'

আখাউরা রোড ধরে আগরতলা থেকে রওনা হল ওরা। আগরতলা শহরের প্রান্তে এসে দেখল পুলিশের দু-দুটো জিপ দাড়িয়ে আছে। বন্দুকধারী সেপাই হাত তুলে গাড়ি থামাতে বলছে। শাজাহান বলল, 'এখানে তো পুলিশ থাকে না। তুই তোমার পরিচয় দে।'

জিপ ধামতেই বাসুদেব নেমে দাঁড়াল। একজন অফিসার এগিয়ে এসেছিলেন, মুখে টর্গের আলো ফেলতেই তিনি বাসুদেবকে চিনতে পারলেন, 'আরে! আপনি?'

'খবরের জন্যে যাচ্ছি।' বাসুদেব হাসল।

'না গেলেই নয়?'

'কেন?'

'সম্মানবাহীদের মুখোমুখি হতে পারেন বলে ইনফরমেশন আছে।'

'ভালই তো। টাটকা কিছু জানা যাবে।'

'যান।' অফিসার ফিরে গেলেন।

জিপে ফিরে আসতেই শাজাহান বলল, 'দেখ, তোমাদের এরা কীরকম খাতির করে।'

'খাতির না আর কিছু। তোকে নিশ্চয়ই চেনে এরা?'

'বিলম্বন। দেবতে পারনি বলে পরে ঘানঘানানি শুনতে হবে না।'

'মানে?'

'বুঝতেই পারছিস।'

ঠিক ভোরের একটু আগে ওরা যেখানে পৌঁছে গেল সেখানে হাট বসবে আজ। ইতিমধ্যেই অস্থায়ী পোকানগুলোর কাঁশ খুলছে। চায়ের দোকানের সামনে এই পাতলা অন্ধকারেও কিছু মানুষ দাড়িয়ে। শাজাহান ওর একপাশে জিপ রেখে বাসুদেবকে নিয়ে এগোল। একটা কাঁধে খোলানো ব্যাগে কিছু পেশাক ভরে নিয়েছিল বাসুদেব। বেশ হালকা।

দ্রুত ওরা মাঠের ভেতর চলে এল। শাজাহান বলল, 'এখান থেকে ঠিক পাঁচ মিনিট হাটলে বর্ডার। এপাশে বর্ডার নিকিউরিটি ফোর্স, ওপাশে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর বর্ডার পাহারা দেওয়ার কথা। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তোকে ওপারে যেতে হবে। তুই এখানে দাঁড়া, আমি আসছি।'

অন্ধকারে একটা বটগাছের নীচে তাকে দাঁড় করিয়ে শাজাহান উঠাও হল। একটু একটু করে আকাশ ফরসা হচ্ছে। শাজাহান বলেছিল রাতের চেয়ে ভোরের দিকেই পারাপার সহজ।

'বলেন মিজ, যাইবেন কোথায়? ঢাকা, চট্টগা, সিলেট? বেশি না, মাত্র পাঁচশো টাকা।'

মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে দেখতে পেল বাসুদেব। পরনে চেক চেক লুঙ্গি আর ফতুয়া। চিবুক থেকে দাড়িটা অনেকখানি নেমেছে। বয়স পঞ্চাশের ওপারে।

'পাঁচশো টাকা? বাসুদেবের মজা লাগছিল।

'একদম চিপ মিজ। এরমধ্যে ট্রেনের ভাড়া আছে।'

'ট্রেনের ভাড়া কত?'

'আরে আগে কন যাইবেন কোথায়?'

'ঢাকায়।'

'তাজাতাড়ি করেন। সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন ছাড়বে আখাউরা স্টেশন থাকা। এরমধ্যে বর্ডার পার, রিকশা, সব ম্যানেজ করতে হইব।'

'তোমার নাম কী?'

'দালাল ফকির আলি বিশ্বাস।'

'বি এস এফ-বি ডির কিছু বলবে না?'

‘আমার কাছে আমার জন্য একটু দোয়া করবেন যেন সবাই ফকিরের ভালবাসে। চলেন, আর কথায় সময় নষ্ট করবেন না।’ দালাল ফকির গুর হাত ধরল।

‘তুই শালা এখানে!’ শাজাহানের গলা শোনা গেল। সে এসেছে পেছন দিক দিয়ে।

‘জ্বরে মিঞা, তোমার মুরগি নাকি?’

‘হাই, মুখ সামলে কথা বলবি। আমার দোস্ত। ন্যাংটা পাহার দোস্ত।’

‘তা হলে আমার টাইম নষ্ট হইল। আচ্ছা, বাই!’ লোকটা আর একমুহুর্ত দাঁড়াল না।

বাসুদেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘লোকটা চলে গেল?’

‘অত্যন্ত বুদ্ধিমান। যেই বুঝেছে একটা পরসোও পাবে না অর্থনি কেটে পড়ল। চলা।’

মিনিট তিনেক হাটার পর শাজাহান বলল, ‘বা দিকে দুটো বি এস এফের জোদান আছে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। তুই সোজা এগিয়ে যা। এদিকে কোনও বেড়োটেড়া নেই। বি ডি আর দেখলে অভ্যালে যাওয়ার চেষ্টা করবি। ওপারে তোর জন্যে একটা লোক অপেক্ষা করছে। তার নাম দালাল আলাউদ্দিন, সে-ই তোকে অটোতে তুলে দেবে। যা।’

মনে মনে নামদুটো ঝালিয়ে নিল বাসুদেব। আলাউদ্দিন তাকে অটোতে তুলে দেবে আর স্টেশনের বাইরে সালাউদ্দিনের চায়ের দোকান।

এখন আর অন্ধকার নেই। ছায়া ছায়া চারধার। রুত হাটল সে। আশেপাশে সীমান্তরক্ষীরা থাকলেও তাদের দেখার কোনও চেষ্টাই করল না। অনেকটা হাটার পর কিছু গাছাছালি নজরে এল। সেদিকে এগিয়ে যেতেই লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা একটি লোক এগিয়ে এল, ‘মিঞার পরিচয় কী?’

‘শাজাহানের বন্ধু।’

‘প্রমাণ?’

পকেট থেকে কার্ডটা বের করে লোকটাকে দেখাল বাসুদেব। সেখাে লোকটা মাথা নড়ল, ‘আমার নাম জানা আছে মিঞার?’

‘আলাউদ্দিন কি?’

‘ও কে। আসেন।’

আলাউদ্দিনের সঙ্গে হাটিতে লাগল বাসুদেব। এখন রোদ উঠব উঠব করছে। কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ল। আলাউদ্দিন বলল, ‘দুশো টাকা চাই।’

বিনাবাক্যব্যয়ে টাকাটা ওকে দিল বাসুদেব। একটা অটোরিকশার সামনে এসে আলাউদ্দিন চোঁচাতে লাগল, ‘করিম, করিম। হালায় এখনও ঘুমায়ে।’

একটি মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল, ‘করিম! তোর বাপ ডাকতেছে।’

একই পরে অচবয়সি একটি ছেলে প্রায় ঘুমঘোরেই বেরিয়ে এল। তার উদ্দেশ্যে কটুফি করতে লাগল আলাউদ্দিন। কোনও প্রতিবাদ না করে অটোতে উঠে বসে তিন-চারবারের চেষ্টার পর ইঞ্জিন চালু করল করিম। আলাউদ্দিন বলল,

‘যান মিঞা, যান।’

‘ওকে কত দিতে হবে?’ বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

‘এই তো,’ টাকার নোট দুটো দেখাল সে, ‘যান।’

অটো চলল। এবড়োখেবড়ো মাটির পথ দিয়ে দুলতে দুলতে চলল। বাসুদেব বুঝতে পারছিল সে এখন বাংলাদেশে। তার খুব ভাল লাগছিল। অটো পিচের রাস্তায় উঠতেই বি ডি আরের গাড়ি চোখে পড়তে লাগল ঘন ঘন। যে-কোনও একটা গাড়ি যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করে তা হলে নির্যাত জেলে যেতে হবে। কিন্তু সেসব কিছুই হল না। ওরা যখন আখাউরা স্টেশনে পৌঁছেল তখন সাতটা বেজে গেল। চারপাশ ইতিমধ্যেই জমজমাট হওয়ার মুখে। করিমকে ছেড়ে দিয়ে সে এমনভাবে হাটিতে লাগল যেন এখানে কতবার এসেছে। স্টেশনটার ঠিক উলটোদিকে যে চায়ের দোকানটা তার ওপর সাইনবোর্ড খুলছে, ‘সালাউদ্দিন কাফে।’

বাসুদেব সোজা ঢুকে পড়ল। দশ-বারোজন খন্দের এইসময় পরোটা আর মাংস খাচ্ছে। পরিবেশনকারীরা ব্যস্ত হতে ঘুরছে। বসার জায়গা নেই। একটি ছেলেকে সে জিজ্ঞাসা করল, ‘সালাউদ্দিনভাই আছেন?’ ছেলটি হাত তুলে বাইরে দাঁড়ানো একটি লোককে দেখিয়ে দিল। টেরিলিনের শাট এবং জিন্স পরা লোকটি এই রেপ্যুরেটের মালিক? বাসুদেব ভেবেছিল আর পচটা সাধারণ চায়ের দোকানের মালিকের মতো পরিশ্রমী কাউকে দেখবে। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘আপনি সালাউদ্দিন?’

‘জি।’

‘আপনার কাছে শাজাহান পাঠিয়েছে।’

‘কোন শাজাহান?’

কথা না বলে কার্ডটা বের করে দেখাল সে। স্টোর ওপর চোখ বুলিয়ে সালাউদ্দিন জিজ্ঞাসা করল, ‘বসুন, কী করতে পারি?’

‘ঢাকায় যেতে চাই।’

সালাউদ্দিন তাকে ভাল করে দেখল, ‘সাতশো টাকা ভাড়া লাগবে।’

‘এত?’

‘আপনার যা চেহারা তাতে থার্ডক্লাসে গেলে পাবলিক সন্দেহ করবে। এ সি তে যান। ওখানে ঢেকিৎ-এ খুব কড়াকড়ি হয় না। বেশি দেরি নেই ট্রেন ছাড়তে।’

চটপট সাতশো টাকা বের করে সালাউদ্দিনের হাতে দিল বাসুদেব। সালাউদ্দিন হাত নিল, ‘অ্যাঁই, সাহেবকে বসা। নাতা দে।’ বলে চলে গেল।

একটা চেয়ার খালি হতেই ছেলটি ছুটে এল, ‘আসেন সাহেব।’

ঝিমে পাখিল। কিন্তু এই সাতসকালে পরোটা মাংস খাওয়ার অভ্যাস না থাকার বাসুদেব ভণ্ড চা বলল। ছেলটি অর্ধক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘নাতা করবেন না?’

‘না।’ সারারাত জেগে কাটিয়ে মুখ না ধুয়ে যে ওসব খাওয়া যায় না তা আর এই ছেলটিকে বলে কী লাভ। চা শেষ হতে না-হতেই সালাউদ্দিন ফিরে এল।

ওকে ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'মাথাখানে এসি। এখনই চলে যান। আর হ্যাঁ, যতটা পারবেন ট্রেনে কম কথা বলবেন। নিন টিকিট।'

চায়ের দাম নিল না সাল্লাউদ্দিন। প্র্যাকটিক্যালি চুকে সে দেখল যাত্রী প্রচুর। এমনি কামরাঙলো ডিড়ে তাঁসা। সে শীতভাপনিয়ন্ত্রিত কামরার সামনে গিয়ে চেকারকে টিকিটটা দেখাতেই তিনি চেকারর দেরি নিয়ে গিলেন। কারার মিলিয়ে জানলার পাশে বসতেই আরাম লাগলেও ভাল ঠান্ডা ভেতরে। সে টিকিটটা দেখল। একশো টাকা বেশি নিয়েছে সাল্লাউদ্দিন। অবশ্য সে-ই যে টাকাটা নিয়েছে একথা বলা যাচ্ছে না। বাঁকা পথে পাওয়া টিকিটের জন্যেও খরচ হতে পারে। এইসময় সাল্লাউদ্দিনের কামিজ পরা একজন মেয়ে তার পাশে এসে বসল। বাসুদেব জানলার দিকে তাকাল।

ট্রেন ছাড়ল। এই আখাউরা থেকে ট্রেন বাংলাদেশের তিন প্রান্তে গিয়েছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং সিলেট। বাংলাদেশের তিনটি প্রধান শহর। পকেটে ট্রেনের বেশ টিকিট আছে। বাংলাদেশের ঢাকাও যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু নেই পাসপোর্ট এবং ডাটে ভিসার ছাপ। যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে তা হলে সোজা জেলে যেতে হবে। অন্যায় সে করছে কিন্তু সময় নষ্ট করার সময় তার নেই।

বাসুদেব ছুটপুট ট্রেনে বসে ঘুমোবার চেষ্টা করল। গোটা রাত জেগে, টেনশন নিয়ে ছুটে আসার জন্যে যা এতক্ষণ বৃকতে পারেনি সেটা জানান দিল। নার্তগুলা ট্রেনে বসার পর হয়তো আরাম পেয়েছিল, পেতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

খটখটানেক বাসে গলার স্বরে ঘুম ভাঙল, 'টিকিট।'

অনেক কষ্টে চোখ মেলে সে। চেকার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চটপট টিকিট বের করে দিল। ভদ্রলোক সেটার ওপর একটা নাগ দিয়ে ওর দিকে তাকালেন, 'ঢাকায় যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'ইন্ডিয়ান।'

মিথ্যা কথা বলতে পারল না বাসুদেব, 'হ্যাঁ।'

'বেড়তে যাচ্ছেন?'

'না। কাজে।'

'আপনার নামটা—?'

বাসুদেব নাম বলল। ভদ্রলোক আর কিছু না বলে অন্য লোকের টিকিট দেখতে লাগলেন। লোকটি তার সব জিজ্ঞাসা করল কেন? অসুস্থি হচ্ছিল বাসুদেবের। হঠাৎ পাশের মহিলা কথা বললেন, 'আপনি কলকাতায় গিয়েছেন?'

বলার মধ্যে বাংলাদেশের টান আছে।

বাসুদেব মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। কেন?'

'কলকাতার কথা আমি বইতে পাড়ছি। খুব যেতে হচ্ছে করে।'

আর কথা না বাড়িয়ে চোখ বন্ধ করল সে। যখন ঘুম ভাঙল তখন মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কিছু খাবেন না?'

বাসুদেব টের শেল ট্রেনটা একটা। স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। কোন স্টেশন? সেই

গত রাতের পর এক কাপ চা পেটে পড়েছিল সকালে। এখন বেশ বিদে পেয়েছে। সে মাথা নাড়ল। তারপর ওঠার চেষ্টা করল। মেয়েটি বলল, 'এখনই ট্রেন ছেড়ে দেবে। আমার সঙ্গে খাবার আছে, খেতে আগ্রহী আছে?'

'আপনার কম পড়ে যাবে না তো?'

'একটুও না।' মেয়েটি তার ব্যাগ থেকে প্যাকেট বের করল, 'কেক আছে।'

বাড়িতে তৈরি কেক। নিন। সঙ্গে পানি আছে।'

কেকটি বেশ বড়। তার অর্ধেক মেয়েটি তাকে দিল। কামড় নিয়ে বাসুদেব বুঝল কেকটি অতীব সুবাস। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি ঢাকায় যাচ্ছেন?'

'আমাকে তুমি বলুন। হ্যাঁ। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।'

'এই কেক কে বানিয়েছেন?'

'আমি। কেন?'

'খুব ভাল হয়েছে, তাই।'

মেয়েটি খুব খুশি হল। কিন্তু খাওয়ার পর আর কথা বাড়াল না বাসুদেব। চোখ বন্ধ করতেই ঠান্ডা কামরার আরামে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ট্রেন ঢাকায় পৌঁছোতে দুপুর হয়ে গেল। মেয়েটির সঙ্গে প্র্যাকটিক্যালি নেমে বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'আম্বা, ধানমন্ডি কত দূর?'

'আপনি ধানমন্ডিতে যাবেন?'

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি এই প্রথম ঢাকায় এলাম। কিছুই চিনি না। বাইরে নিশ্চয়ই

ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। চলুন।' সে পা বাড়াল।

'আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমিও ধানমন্ডিতে যাব। ওখানেই থাকি।

আপনি আমার সঙ্গে চলুন।' মেয়েটি বলল।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা স্কটার ভাড়া করল মেয়েটি। কথাবার্তায় বাসুদেব বুঝল স্কটারকে এখানে বেবি ট্যাক্সি বলা হয়। স্কটারে উঠে সে বলল, 'আমার দেখে বেশ ভাল লাগছে। আপনার ব্যসি একটি মেয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে একা ট্রেনে চেপে ঢাকায় চলে এলেন। অর্ধাৎ এখানে মেয়েদের অবস্থা আর আগের মতো নেই।'

'তা ঠিক নয়। আমার বাবা নেই। মায়ের পক্ষে আসা সম্ভব নয়। তাই একা না এসে কী করি বলুন। আপনি ধানমন্ডির কোথায় যাবেন?'

পকেট থেকে কাগজটা বের করল সে। আসবার আগে বাবলচাচার ঠিকানা সে আলাদা কাগজে লিখে এনেছিল। সেটা শুনে মেয়েটি উত্তেজিত, 'আরে। এটা তো আমাদের পাশের বাড়ি। ওই বাড়িতে আমার ফেড থাকে। ওর নাম ছুটি।'

'ছুটি? বাবা, কী সুন্দর নাম।'

'আপনি তো আমার নামই জানলেন না।'

'হ্যাঁ। সরি। কী বেনে নামটা?'

'লাবণ্য।'

অবাক হয়ে তাকাল বাসুদেব। লাবণ্য হাসল, 'শেখের কবিতার নই কিন্তু।'

'ঠিকই। শেখের কবিতার লাবণ্য এত সাহস পেত না।' বাসুদেব বলল।

ঢাকার রাস্তাঘাট দেখে বেশি অবাক হচ্ছিল বাসুদেব। বেশ চওড়া, বিদেশের সঙ্গে মিল আছে। কলকাতায় এমন রাস্তা নেই। প্রায়ই চাইনিজ রেস্টুরেন্টের নিয়োনে সাইন চোখে পড়ছে। চিনে খাবার লোভনীয় এখানে বেশ জনপ্রিয়।

‘ওই রাস্তায় বসবন্ধুর বাড়ি।’

‘তাই?’ বাসুদেব খুঁকে দেখল।

সুন্দর একটি রাস্তায় ঢুকল বেবি ট্যাক্সি। একটি বাড়ির সামনে লাংঘা তাকে দাঁড় করাল, ‘এসে গেছেন। ওটা ছুটির বাড়ি।’

নেমে ভাড়া দিতে গেলে মেয়েটি আপত্তি করল। বাসুদেব তাকে কর্পট ধমক দিল, ‘তুমি বাড়ির কেবল বাইরেই, এখন একটাও কথা বলবে না।’

ভাড়া মিটিয়ে দিলে লাংঘা নিজেই এগিয়ে গেল বেশ বাজাতে। একবারেই দরজা খুলল একটি ছেলে, ‘ও, তুমি! ছুটি বাসায় নাই!’

‘ছুটির জন্য আসি নাই। তোমাদের বাসায় একজন মেহমান এসেছেন।’ লাংঘা বলল, ‘আসুন।’

বাসুদেব এগিয়ে গেল, ‘বাদলচাচা আছেন?’

‘আপনার নাম?’

‘বাসুদেব।’

‘হ্যাঁ, আছেন। কী বলব?’

‘বলুন ইন্ডিয়া, আগরতলা থেকে বাসুদেব এসেছে।’ শুনে ছেলোট চলে গেল। এবং তার এক মিনিটের মধ্যেই বাদলচাচার চিংকার শোনা গেল, ‘আরে বাসুদেব! হোয়াট এ সারপ্রাইজ? তুমি ঢাকায়! আসো, আসো, কাম ইন।’

আসরামুল হক বাদলের চেহারা প্রায় একইরকম রয়ে গেছে। প্রাথমিক অভ্যর্থনার পর তাঁর খেয়াল হল, জিজ্ঞাসা করলেন, ‘লাংঘা, তুমি এরে পাইলস কোথায়?’

বাসুদেব বলল, ‘আমরা এক ট্রেনে এসেছি।’

‘ট্রেনে? আখাউরায় তুমি—’ আমি কিছুই বুঝতেছি না।’

‘আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি।’ বাসুদেব হাসল।

লাংঘা বলল, ‘আমি তা হলে যাই।’ বাসুদেব মাথা নাড়লে সে চলে গেল।

বাদলচাচা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার লাগেজ ওই একটাই?’

‘হ্যাঁ।’

‘আসো। ভিতরে আসো।’

আধঘণ্টা পরে রান দেরে চা খেতে খেতে বাদলচাচার সঙ্গে কথা বলছিল বাসুদেব। যা যা হয়েছে তার সবই বিস্তারিত বলল সে। সব শোনার পর বাদলচাচা বললেন, ‘তোমার ধারণা ওদের নেতা বাংলাদেশের মধ্যে আছে অথচ এখানকার কোনও পেপার পত্রিকা জানে না।’

‘ওর বাবা মে টেলিফোন মাঝার দিচ্ছেল সেটা ডায়াল আমি নিজে করেছি। লোকটার কথাও শুনেছি। মাঝরাটা বাংলাদেশের।’ বাসুদেব বলল।

‘ঠিক আছে। চিন্তার কিছু নাই। আইশা যখন পড়ছ তখন দেখতেছি কী করা

যায়।’

‘আমার হাতে সময় কিছু খুব কম।’

‘বুঝলাম। তোমার তো পাসপোর্ট ভিসা নাই।’

‘নেই।’

‘একাত্তর সালে যখন আমরা তোমাদের বাসায় ছিলাম তখন আমাদেরও ছিল না।’

‘তখন বুদ্ধ হচ্ছিল। আইনকানুন ছিল না।’

‘ঠিক। যদিও তুমি একটা মারাত্মক সমস্যা নিয়ে ঢাকায় আসছ কিন্তু আইনের চোখে তুমি অপরাধী। তাই বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক না।’ বাদলচাচা ফোন তুললেন। ডায়াল করে বললেন, ‘ব্রিঞ্জা, কী করতেছেন? আরে ওসব ছাড়েন, আমার বাসায় জলদি আসেন। হ্যাঁ, কখনও তো বলি নাই, সারপ্রাইজ দিতে চাই, আসেন।’

ফোন রেখে দিলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, ‘তুমি যে নখর বললা সেটা যদি ঠিক হয় তা হলে লোকটা আছে সিলেটে। কিন্তু সিলেট তো ছোট গ্রাম না যে গেলেই তারে পাইবা। সোনাতাই আসতেছে, দেখি সে কী বলে।’

আকবর হাফিজ সোনা খুব সিরিহাস ধরনের মানুষ। বেশ গম্ভীর হয়ে থাকতেন। তুলনার বাদলচাচা বেশ মজার কথা বলতেন বলে তাঁর ঠিকানা নিয়ে এসেছিল বাসুদেব। আখচাঁটার মধ্যে সোনাচাচা চলে এলেন। মাথায় টাক পড়েছে, পরনে পাজামা পাজাবি।

বাদলচাচা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এরে চেনেন?’

‘না।’ মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। তারপর কলকাতার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে আপনি?’

‘আমি বাসুদেব।’

‘বাসু বাসু, আগরতলায় বাড়ি?’

‘হ্যাঁ।’

‘মাই গড। তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ।’

বাদলচাচা বিদেশি কোম্পানির নাম উল্লেখ করে জানাল বাসুদেব ওই কোম্পানির রিপোর্টার।

‘আমি তোমার নাম শুনেছি। তবে ভাবতে পারিনি। তোমাকে যখন আমি প্রথম দেখেছিলাম তখন তুমি শিশু। তা ঢাকায় কি বেড়াতে এসেছ?’ সোনাচাচা জিজ্ঞাসা করলেন।

বাদলচাচা বাসুদেবের আমার কারণ এবং উদ্দেশ্য ওঁকে বলতে উনি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘এটা যখন সরকারি টেলিফোন তখন লোকেট করতে অব্যবহিত হবে না। তুমি তো অনেক দূর থেকে এসেছ, রেষ্ট নাও। আমি দেখছি কী করা যায়।’

‘আপনি কি পুলিশে স্বর দেবেন?’ বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

‘দিলে পুলিশকে তোমার কথা বলতে হবে। তোমার এই বেআইনিভাবে

আনাটা পুলিশ মেনে নেবে না। তারওপর পুলিশ ওখানে পৌঁছোবার আগেই পাখি উড়ে বাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।'

'তা হলে?'

'দেশ স্বাধীন হয়েছে তিরিশ বছর। কিন্তু আমরা যারা রাজ্যকার নই, মুক্তিযুদ্ধে शामिल হয়েছিলাম তারা এখনকার অনেক ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই। আমাদের একটা সংগঠন আছে। তিরিশ বছর আগে স্বাধীন যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের অনেকেই এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু আমাদের সংগঠনে অনেক যুবক शामिल হয়েছে বাদের মনে দেশপ্রেম জাগতে পেরেছি। আমাদের কাজ হল কোথাও কোনও অবিচার হলে তার প্রতিবাদ করা। সরকারের নজরে নিয়ে আসা। তুমি চিন্তা করো না। তোমার বাবার কাছে আমাদের যা ক্ষণ তা তো কখনই শোধ করতে পারব না। সবাইকে বলি সেইসব দিনের কথা। তিনি শুধু আশ্বাসই দেননি, নানাভাবে আমাদের সাহায্যও করেছেন। আজ তোমাদের পরিবারের বিপদ। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ সরকার এসব খবর এখনও পাননি। কিন্তু যোড়ী বিশ্বাসঘাতক যে কারটা করতে সাহায্য করছে আমরা তার প্রতিবাদ করব। বাদল, আমি উঠলাম।' সোনাচাচা চলে গেলেন।

অকবর হাফিজ সোনার কথায় মনে জোর পেল বাসুদেব। কিন্তু কীভাবে তিনি কাজটা করবেন তার হিমশি সে পাচ্ছিল না। বাওয়াদাওয়ার পর সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাদলচাচার ডাকে ঘুম ভাঙল। বাদলচাচা বললেন, 'জলদি তৈরি হও, সোনা আসতেছে।' সেই বিকেল থেকে সে একনাগাড়ে ঘুমোচ্ছে। ঘড়িতে এখন রাত আড়াইটে। বাসুদেব বলল, 'এখন?'

'ফোন করেছিলাম'

ঝটপট তৈরি হয়ে নিল বাসুদেব। বাদলচাচাও জামাপ্যাট পরে এলেন। একটু বাদেই বাড়ির সামনে দুটো মাইক্রোবাস এসে দাঁড়াল। এগুলো দেখতে অনেকটা নুমেরো মতো, একটু বড়। সোনাচাচা নেমে এলেন প্রথম গাড়ি থেকে। বললেন, 'চলো বাসুদেব, আমরা তৈরি। বাদল, তুমি বাড়িতে থাকো।'

'কীরকম?'

'বাদলচাচা অস্থির হন।
'জাকার একজনের থাকা দরকার। যদি কোনও সমস্যা হয় তা হলে আমি তোমাতে জানাব। তুমি সঙ্গে সঙ্গে কাকে কী বলতে হবে, কী করতে হবে ঠিক করবে। তোমার বাড়িটাই হবে আমাদের হেড-কোয়ার্টার্স। দুদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে না।'

'আমার মোবাইল নাথাক—!'

ডাকে থামিয়ে দিলেন সোনাচাচা, 'মোবাইলে সবসময় লাইন পাওয়া যায় না। এনা বাসুদেব।'

গাড়ির কাছে গিয়ে বাসুদেব বৃদ্ধকে পারল সোনাচাচার সঙ্গে অনেক ছেলে এসেছে। সে প্রশ্ন করতেই জানতে পারল মোট কুড়িজন এসেছে। এরা সবাই বুঁব ডেকিরেটেড, সাহসীও। কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাস্তার এই সময়ে সোনাচাচা কীরকম এত ছেলে জোগাড় করলেন ডাকতেই পারছিল না বাসুদেব। অর্থাৎ

বাদলচাচার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডব্রলোক আর এক মিনিটও বিক্রম নেননি।

দুটো গাড়ি ছুটে বাচ্ছিল রাস্তার নির্জন রাজপথ দিয়ে। শেষপর্যন্ত শহর পেছনে রেখে স্বর্ন হাইওয়ে ধরল তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। মাকখানে একবার হাইওয়ে পুলিশ গাড়ি থামিয়েছে। সোনাচাচা নেমে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতেই তারা বাওয়ার অনুমতি দিল।

খটা ছয়েক বাওয়ার পর গাড়ি থামল রাস্তার পাশে একটা ধাবাজাতীয় খাবারের দোকানের সামনে। বাসুদেব দেখল ছেলেদের সংখ্যা উনিশ। অর্থাৎ সোনাচাচাকে ধরল কুড়ি। প্রত্যেকেই গ্যাটশার্ট পরা আর উর্কানে একটা বড় গামছা জড়ানো। একটা হাত খোঁজবে গামছার ডলায় তুলে রেখেছে তাতে যুক্ত হতে অসুবিধে হচ্ছে না যে ওরা প্রত্যেকেই অস্ত্র ধরে আছে। সোনাচাচার নির্দেশে অতি দ্রুত তারা প্রাকৃতিক কাজ শেষ করে খাবার খেয়ে নিল। তারপর আবার গাড়ি ছাটল।

বিকেল নাগাদ নদী পার হই গয়া। এপারে এসে সোনাচাচা বললেন, 'এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম। সন্দের সময় রাস্তায় পুলিশ বেশি সক্রিয় হয়।'

গয়া চায়ের দোকানে যা পাওয়া যায় তাই খাওয়া হল। দুপুরে এবং এখন বাসুদেব খাবারের দাম দিতে গিয়েছিল কিন্তু সোনাচাচা রাজি হননি। বলেছেন, 'তুমি আমাদের অতিথি। আমরা স্বর্ন আগরতলার গিয়েছিলাম তখন তো তোমরাই খাইয়েছিলো। অর্থও চূপ করে থােক।'

বাসুদেব ভাবছিল সৌমিত্রর কথা। ও এখন কোথায় কীভাবে আছে তা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু তার মন বলছিল ওকে ফেরত পাওয়া যাবে। যেভাবে বিনা নাথায় পর পর ঘটনাগুলো ঘটেছে তাতে এই বিশ্বাসটা আরও জোরালো হচ্ছে। দশরথের গায় যাওয়া, তাকে তুলে এনে বিশ্বজিৎয়ের সোনা নাথার পাওয়া, প্রায় বিনাবাধায় তার বাংলাদেশে চলে আসা এবং এককথায় সোনাচাচার সাহায্য পাওয়ার পর এই আশা বেড়ে গিয়েছে। সোনাচাচা বলেছেন ওয়া যাচ্ছে শীঘ্রই। মুক্তিযুদ্ধের সময় কুদ্দুস আলি নামের এক তরুণ ওর সহযোগী ছিলেন। সেই ডব্রলোক এনি শীঘ্রইর এক চা-বাগানের মালিক। ডব্রলোক নাকি অনেকবার সোনাচাচাকে নৈমন্ত্র্য করেছেন যাওয়ার জন্যে, যাওয়া হয়নি। সোনাচাচা তাঁকে কোনও ঘটনা না বলে বিশ্বজিৎয়ের টেলিফোন নাথার দিয়ে অনুরোধ করেছেন সোনাটা কোথায় তার অনুসন্ধান করতে। বিশ্বজিৎকে যদি কোনওভাবে পাওয়া যায়, যদি সে এরমধ্যে অন্য কোথাও চলে না যায় তা হলে সৌমিত্রর মুক্তির সম্ভাবনা থাকবে।

আজ সকালে ছেলেটি সৌমিত্রর পা থেকে চেন খুলে দিল। দুটো পায়ের ফত আরও বেড়েছে। ব্যথা হচ্ছে খুব। একটু একটু রস গাড়েছে। অবিরাম হিটা, জুতো ও বাগির সংখ্য, তারওপরে লোহার বালা পায়ের ঘষে ঘষে এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে সৌমিত্রর ভয় হচ্ছিল সেপটিক না হয়ে যায়। তবু বালা খোঁজার পর সে রসিকতা করল। 'খুলে তো নিলে, যদি পারিয়ে যাই?'

ছেলেটি সিরিয়াস গলায় বলল, 'পারবেন না।'

‘কেন?’

‘প্রথমত, রাস্তা চেনেন না। এখানে কোনও মানুষ নেই যে আপনাকে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, এই পা নিয়ে আপনি বেশি দূর হটিতে পারবেন না। তৃতীয়ত, বড়ার পেরোতে গেলে বি ডি আর আপনাকে গুলি করবে। অতএব মরতে চাইলে ওই চেষ্টা করতে পারেন।’

‘তোমরা কী করে পারাপার কর?’

‘আমরা রোজ্ঞ জানতে পারি কোন সময় ওরা কোন জায়গাটা থেকে পাহারা তুলে নেবে।’

‘বি ডি আর তোমাদের সাহায্য করছে?’

‘বি ডি আর কেন করবে? ওদের কিছু লোক করছে। এই পৃথিবীতে টাকা দিয়ে অনেক কিছু কিনতে পারা যায়।’ হেলেরিটর মুখ শক্ত হল।

‘তোমাদের পারা যায়?’

‘দু-একজন হয়তো লোভ সামলাতে পারে না তবে তারা বেশিদিন বেঁচে থাকে না।’

‘হাক সে, আমি কিছু ওষুধ লিখে দিয়েছিলাম, সেগুলো পাওয়া যায়নি? আর ঘেরি করলে হয়তো পা-টাকে বাঁচানো যাবে না?’ সৌমিত্র বলল।

‘আপনি প্রশ্নের কথা না ভেবে পায়ের কথা ভাবছেন?’

দুপুরে জেস্টার এল। শুয়েছিল সৌমিত্র। দুটো হেলে দাড়া খেলছিল। জেস্টার বলল, ‘নাও উঠর; তোমার ওষুধ।’

উঠে বসল সৌমিত্র। ব্যাঙটা বুলে দেবল সে যা যা ওষুধ চেয়েছিল তার সবগুলোই আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মলমটা লাগিয়ে দিল দুই পায়ে। তারপর অ্যান্টিবায়োটিক হাতে নিয়ে জলের বোতলটা তুলে নিল। ওষুধ খাওয়া চূচুচাপ দেখছিল জেস্টার। তারপর বলল, ‘দশরথ দেববর্মার নাম কখনও শুনেছ?’

‘না। তিনি কে?’

‘একটা মানুষ। তারে পাওয়া যাইতেনে না। সেইসঙ্গে তোমার বুনের স্বামী রিপোর্টারও উধাও। তুমি জান কিছু?’ জেস্টার প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল সৌমিত্র, ‘আমি কী করে জানব? আমাকে ভো তোমরাই ধরে রেখেছ।’

‘হঁ। উঠর। তোমার উপর কোনও অত্যাচার আমরা করি নাই। কী ঠিক না?’

‘না করলে পায়ের এই অবস্থা কেন হবে?’ দুটো পা দেখাল সে।

‘এইটার পিছনে আমাদের কোনও হাত নাই। তোমার বাপের মতলবটা কী?’

‘এসব প্রশ্ন আমাকে কেন করছ? আমার সঙ্গে কি কোনও যোগাযোগ আছে?’

‘আছে। আর দুইটা দিন। তার মধ্যে যদি টাকা না দেয় তাহলে বুঝতেই পারবে, এখানেই তোমার কবর খুঁড়তে হইবে।’ জেস্টার চলে গেল।

সৌমিত্র অবাক হচ্ছিল। দশরথ কে? তাকে নিয়ে বাসুদেব কোথায় উধাও হয়েছে? বাবা যে এখনও টাকা দেয়নি এটা বোঝা যাচ্ছে। এদের সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে টাকা দিলে এরা তার কতি করবে না। কিন্তু এতগুলো টাকা দিয়ে মুক্তি

কিনবে সে? সারা জীবনে কি এই টাকা জমিয়ে কণাশোধ করতে পারবে?

হেলেরিট এল। একটা হাফপ্যান্ট এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘এটা পরে নিন।’

‘কেন? এই জাতিয়ার বেশ আছি।’

‘হঠাৎ?’

‘তোমরাই তো আমাকে এই অবস্থায় এনেছ।’

‘এবন বলছি এই হাফপ্যান্ট পরে ফেলুন।’

পরল সৌমিত্র। একটু তিলে হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘দশরথ দেববর্মাকে?’

‘কোন দশরথ দেববর্মাকে?’

‘এই নামে তুমি কাজকে চেন?’

মাথা নাড়ল হেলেরিট। কিন্তু সৌমিত্রর মনে হল ও নিশ্চয় বলছে।

‘আপনার পা কেমন আছে?’

‘খুব খারাপ।’

‘আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। মানুষের শরীরে হঠাৎ যে-সমস্ত রোগ হয় তার একটা লিষ্ট করবেন, করে সেইসব রোগের জন্যে যে ওষুধ খাওয়া দরকার তা লিখে দেবেন।’

‘হঠাৎ?’

‘আমাদের সঙ্গে সবসময় ডাক্তার থাকেন না। থাকলেও হচ্ছে করলেই ওষুধ পাওয়া যায় না। ওগুলো আমরা একটু বেশি পরিমাণেই আনিয়ে রাখতে চাই।’

‘তার মানে আমাকে প্রেসক্রিপশন লিখতে হবে। পারিশ্রমিক দেবে তো?’

হেলেরিট হাসল, ‘আপনি অজুত লোক।’

‘কীরকম?’

‘কত নেনেন? দুশো, তিনশো? নিয়ে খরচ করবেন বেশখায়? এমন হো হুতে পারে দুদিন বাসে আপনি পৃথিবীতে থাকবেন না। তখন?’ হেলেরিট মাথা, ‘দান্য।’

‘কথটা মন্দ বলনি। ঠিক আছে দাতব্য কাজ। কাগজ কলম নিয়ে এসো।’

সৌমিত্র বলল। হেলেরিট কিছুক্ষণের মধ্যে কাগজ কলম এনে দিল। সৌমিত্র মনে করে করে যতটা পারে সম্ভাব্য অসুখ এবং তার ওষুধের লিষ্ট তৈরি করল। এর অনেকগুলো আগরতলায় ছাড়া ত্রিপুরার অন্য কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা কম। যেসব ওষুধ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করেও খাওয়া যায় সৌমিত্র সেইসব ওষুধের নাম লিখল। লিষ্ট নিয়ে হেলেরিট চলে গেল সৌমিত্র উঠল। হঠাৎ কষ্ট হচ্ছে কিন্তু ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, কটা দিন পানুটোকে বিশ্রাম দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

কয়েক পা হটিতেই সে দেখতে পেল দাবার বোর্ড সাজিয়ে একজন গ্রহরী গালে হাত দিয়ে ভাবছে। এই লোকটি পর্বতা উপজাতী গোষ্ঠীর। অবশ্যই বাংলা জানে না। ওর সঙ্গে বিপ্লবী হেলেরিট কথা বলে যে ভাষায় তা বুঝতে পারেনি সৌমিত্র।

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে লোকটির উলটোদিকে বসল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখচোখে অবশ্যি ফুটে উঠল। মুক্ত অবস্থায় সৌমিত্র যেখানে ছিল

সেখানেনই থাকলে সে যেন খুশি হত। সৌমিত্র কুক্কো বোর্ড দেখল। তারপর দুটো বাড়ি এগিয়ে দিয়ে হাসল। লোকটি চারপাশে তাকাল, একটি ভাবল, তারপর প্রথম চাল দিল। সৌমিত্র খানিক বাতাই লক করল শীর্ষমের্যাদী পরিকল্পনা করে খেলার ধর্ম লোকটির নেই: ষটপট আক্রমণ করে শত্রুর শক্তি হ্রাস করাই তার উদ্দেশ্য। ফলে একসময় দু'পক্ষের বল কমতে কমতে তিন তিনে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটির মুখচোখে এখন হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। যেন সৌমিত্র তাকে জিততেই হবে। সৌমিত্র এবার ইচ্ছে করে ভুল চাল দিতে লাগল। উল্লসিত লোকটা সহজেই জিতে গিয়ে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠল। সৌমিত্র চলে আসার জন্যে পা বাড়াতোই লোকটি গুর হাত ধরল। তারপর জোর করে বসিয়ে নতুন করে বোর্ড সামলে লাগল। অর্থাৎ গুর সঙ্গে আবার খেলতে হবে। সৌমিত্র এটাই চাইছিল।

দুপুরের খাবার নিয়ে হেলেকটির সঙ্গে এল যে লোকটা তার চালচলন বেশ নেতা গোছের। লোকটি ইংরেজি জানে। শোঝা সামনে এসে বলল, 'এটা কী লিখেছ?' সৌমিত্র দেখল তার লেখা লিস্টটা লোকটার হাতে। বলল, 'যা তোমরা চেয়েছিলে।'

তখন দাবা খেলা বন্ধ। উপজাতীয় লোকটি দূরে বিগল্ড ভবিতো দাঁড়িয়ে আছে। নেতা বলল, 'এসব ওষুধ তো বাচ্চা ছেলেও জানে। লাইফসেসিভি ওষুধগুলোর নাম লিখে দাও।'

'পেনেস্ট না দেখে কোনও ডাক্তার ওইসব ওষুধ প্রেসক্রাইব করবে না।'

'কোন ডাক্তার কী করে তা আশার জনার দরকার নেই, তুমি লিখবে।'

'অসম্ভব। ডাক্তারি শাস্ত্রবিরোধী কোনও কাজ আমি করতে পারব না।'

'তুমি লিখবে না?'

'নো। নেভার। যে ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে খাওয়া ঠিক নয় তা আমি লিখতে পারি না।' সৌমিত্র কথাগুলো বলামাত্র লোকটি সবচেয়ে চড় মারল। পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল সৌমিত্র। কিন্তু ততক্ষণে লোকটি আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দু'হাতে মারতে মারতে চোঁচাচ্ছে, 'শালা, কুড়া, বাঙালির বাচ্চা, তোকে মেরেই ফেলব আমি।'

হেলেকটি ছুটে এল, 'মিঃ, শান্ত হোন, মিঃ—।'

নেতা এবার ছেড়ে দিলেন সৌমিত্রকে, 'কী এবার লিখবি?'

সৌমিত্র বসে পড়েছিল দু'হাতে মাথা ঢেকে। সেই অবস্থায় সে বলল, 'না।'

নেতা আবার তেড়ে আসছিল এইসময় গলা পাওয়া গেল, 'কী ব্যাপার?'

সৌমিত্র মুখ তুলে দেখল জেস্টার এগিয়ে আসছে। নেতা তাকে বলল, 'এই ডাক্তার আমাকে অপমান করেছে। আমার নির্দেশ মানেনি।'

'কেন?'

'এই বাঙালির বাচ্চাটাকে খুন করা উচিত।' নেতা চোঁচাল।

জেস্টার এগিয়ে গেল সৌমিত্রর কাছে, 'ডক্টর।'

সৌমিত্র মাথা নাড়ল, 'আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তুমি ওষুধের নাম লিখবা না?'

১০০

'লিখে দিয়েছি।'

জেস্টার হেলেকটির দিকে তাকাতো সে বলল, 'হ্যাঁ, উনি একটা বড় লিস্ট লিখে দিয়েছেন।'

'কিন্তু তাতে অ্যাক্টিব্যারোটিকের নাম নেই, লাইফসেসিভি কোনও ওষুধ নেই,' নেতা বলল।

হেলেকটি বলল, 'উনি বলেছেন পেনেস্ট না দেখে ওসব ওষুধ দেওয়া যায় না।'

'ঠিকই।' জেস্টার বলল, 'উলটো কাম হইতে পারে। কার শরীরে কী আছে তা জানা না থাকলে ওইসব ওষুধ খাওয়ানো ঠিক না।'

'আমি এটাই বলতে চেয়েছি।' সৌমিত্র কোনওমতে উঠে দাঁড়াল।

'তুমি এই কারণে গুকে মারলো?'

'না মানে—।'

'বুঝি। চলো আমার সাথে।'

'আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কথাটা কমিটির বলবা। এই লোকটারে ধরার পর থিকা আমরা গুর শরীরে হাত দিই নাই। ডক্টর আমাদের সাথে কোঅপারেট করছে। আজ সে কোনও অন্যায় না করা সত্ত্বেও তুমি তারে মারছ। এ ব্যাপারে দলের যা আইন তা তোমার জানা আছে।' জেস্টার নেতাকে নিয়ে চলে গেল।

হেলেকটি এগিয়ে এল, 'সরি।'

'এই লোকটার কী হবে?'

'ছয় ঘা বেত। আমাদের দলের কেউ অন্যায় করে ছাড়া পায় না।' হেলেকটি বলল।

দুটো গাড়ি যখন চা-বাগানে পৌঁছেল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। জায়গাটা পাহাড়ি। চা-বাগানের লাগোয়া জায়গায় বাড়ির কম। যা আছে সেগুলো বাংলা টাইপার। অনেকটা ভূমি নিয়ে তার বাউন্ডারি ভিতর বাংলা। চারপাশ খুব শান্ত।

কুন্দুসদাহব খবর পেয়ে ছুটে এলেন, 'আসেন আসেন সোনাতাই। একেবারে সন্দলবলে?'

'একটু অসুবিধায় ফেললাম আপনাকে।' সোনাতাচা বললেন।

'আরে ছাত্তেন! এটা আপনাদের ঢাকা শহর না, এখানে দশ-বিশজন মানুষে কোনও প্ররম্ভে হয় না। কিন্তু কী ব্যাপার কন তো? কুন্দুসদাই জিজ্ঞাসা করলেন। তার কৌতূহল মেটাতে সোনাতাচা বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

সোফায় বসে বললেন, 'আপনাকে একটা ফোন নাথার দিয়েছিলাম—।'

হাত তুললেন কুন্দুসদাহব, 'পাইছি। একেবারে নাকের সামনে।'

'তার মানে?'

'ওটা একটা সিঙ্গাপুরি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন নাথার।'

'সিঙ্গাপুরি?'

‘হা। গেটের উপর লেখা আছে তাই। কিন্তু অনেকদিন কোনও সিন্সাপুরিকে ওখানে কেউ দেখে নাই। লোকজন অবশ্য থাকে কিন্তু তারা কারও সঙ্গে ঘেঁষে না। ডিস্টার্ব করে না তাই আমরাও কোনও কৌতুহল দেখাই না।’

‘কতজন লোক থাকে?’

‘তা তো জানি না মিঞা। তবে এক মহিলা আছেন, মনে হয় বার্মিজ বা সিন্সাপুরিয়ান, ডাইভার নিয়া মাঝে মাঝে বাজারে বান।’

‘কেউ ওদের কাছে আসে না?’

‘খবর রাখি না।’

‘বাড়িটা কোথায়?’

‘হাক এ মাইল ফ্রম দিস গার্ডেন। ডান দিকের রাস্তায়। কিন্তু কী ব্যাপার! ওদের খোঁজ কর ক্যান?’ কুদুসসাহেব উৎসাহিত।

সোনাতাচা তখন তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। শুনে চোখ বড় হয়ে গেল কুদুসসাহেবের, ‘মুশকিল ইয়্যা গেল।’

‘কেন?’

‘আমার বাগানের একটা আলাদা রেসপেক্ট আছে। ধরেন আপনারা ওখানে গিয়া দেখলেন যাদের ষ্টিজতেছেন তারা নাই, তখনই প্রব্রম।’

‘বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এর ফ্যামিলির কাছে আমি, আমরা কৃতজ্ঞ। আপনি তো জানান, স্বাধীনতায়ুদ্ধের সময় এরা আমাদের পাশে কীভাবে দাঁড়িয়েছিল।’

‘জানি। ঠিক আছে। এক কাম করেন। আপনারা মিনেরবেলায় চূপচাপ থাকেন। আমার বাগানের এন্ড-এ আমারই একটা খালি কাঠের বাড়ি আছে। সেখানে সবাই নিদ্রা থাকেন। গাড়ি এখানে থাকুক। স্যারসিন বিশ্রাম করেন, বাওয়াদাওয়া করেন, সন্ধ্যার পর দ্যাখনে ঠিক জায়গায় আসছেন কি না। কুদুসভাই বললেন।

তাই করা হল। চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে সেই খালি কাঠের বাড়িতে চলে এল ওরা। নীচে হাফথর, ওপরে দুটো শোওয়ার ঘর। কুদুসসাহেব এলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ বাসে খাবার এল।

সোনাতাচা ছেলেরদের নেতাকে ডেকে বললেন, ‘দুজন করে ছেলে যেন বেড়াতে বেরিয়েছে এমনভাবে হেঁটে যাবে। গেটের ওপর সিন্সাপুরের দাতব্য প্রতিষ্ঠান লেখা সাইনবোর্ড আছে। বাড়িটার সামনে একদম দাঁড়াবেন না। হেঁটে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসবে। লক্ষ রাখবেন ওই বাড়ির ভেতরটা দেখা যায় কিনা। কেউ আসে যায় কিনা। ওরা ফিরে আসার আধখণ্টা পরে অন্য একজনকে পাঠাবেন। একজন। সে ফিরে এলে আবার দুজন যাবেন। এইভাবে সড়ে পর্যন্ত চললে হয়তো কিছু খবর পড়ে পারি। বলে যাও, কেউ যেন এমন কিছু না করে যাতে ওদের মনে সন্দেহ তৈরি হয়।’

ঘণ্টা দেড়েক বাসে রিপোর্ট এল বাড়িতে কেউ নেই, অন্তত বাইরের রাস্তা থেকে তাই মনে হচ্ছে। সোনাতাচা সঙ্গে মোবাইল ছিল। বাসুদেব বলল, ‘একবার ডায়াল করে দেখবেন নাকি?’

‘কেন?’

‘গলা শুনে বলতে পারব বিশ্বস্তিত্ত সেবর্মী ওখানে আছে কি না।’

‘বোধহয় ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয়ই ওর বাবাকে ফোন করে পায়নি। যা নেটওয়ার্ক বলছে তাতে নিশ্চয়ই জেনে গেছে ওর বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য ওর আর এই নাথারের থাকার কথা নয়। তবে বিদেশে আছে বলে ভাবতে পারে ওকে এখানে কেউ ছুঁতে পারবে না। কিন্তু আবার যদি ব্র্যাক কল যায় তা হলে ও পালিয়ে যেতে পারে।’

সোনাতাচা কথায় মুক্তি আছে। কিন্তু এত কাণ্ডের পর যদি ওই বাংলাতে গিয়ে দেখা যায় বিশ্বস্তিত্ত সেবর্মী নেই তা হলে? তা হলে আগরতলার ফেরার মুখ থাকবে না। এখন মনে হচ্ছে লটারির টিকিট কাটার মতো হয়ে গেল ব্যাপারটা। উল্টে দশদশক ধরে রাখা, যতটা দেওয়ার পুরোটা দান্নিহ তাকে নিতে হবে। প্রমাণ করতে পারলে আইন শাস্তি দেবে না হলে টাইগাররা চূপ করে থাকবে না। বাসুদেবের খুব ইচ্ছে করছিল মোবাইলে ফোন করে দেখে বিশ্বস্তিত্ত সেবর্মী ওই বাড়িতে থাকে কিনা।

শ্রীমঙ্গলের এই অঞ্চল বর্ডার থেকে বেশ কিছুটা দূরে। নিশ্চয়ই সৌমিত্রকে ধরে এনে ওরা ওই বাড়িতে রাখেনি। বাংলাদেশের এই প্রান্তে টাইগারদের কয়েকটা ক্যাম্প আছে। সেই ক্যাম্পে নিশ্চয়ই প্রচুর লোক আয়গোপন করে আছে। এই বাংলাতে সেটা সম্ভব নয়। তা হলে কাছাকাছি ক্যাম্পটা কোথায়? সেখানেই ওরা সৌমিত্রকে রাখতে পারে। সর্বাধিনায়কের কাছাকাছি তো ওই ক্যাম্প থাকা উচিত। বাসুদেবের মাথাটা ব্যাপা হয়ে যাচ্ছিল।

এগারোটা নাগাদ পেট্রল টিম এসে জ্ঞানাল একজন মধ্যবয়সী মহিলাকে ওই বাংলাতে ঢুকতে দেখা গেছে। পেট্রল টিম সে বাগান পেরিয়ে ভেতরের দরজায় বেল টিপছিল। কেউ খোলার আগে ওদের সরে যেতে হয়েছিল বাড়িটার সামনে থেকে। দাঁড়িয়ে থাকলে যদি কারও সন্দেহ হয় তাই দরজা খোলা পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করতে পারেনি।

সোনাতাচা ভিজ্ঞাস্য করলেন, ‘মহিলাকে দেখে কী মনে হল? শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত?’ দুটি ছেলের একটি মাথা নাড়ল, ‘না স্যার। বাঙালি। স্থানীয় মহিলা।’

‘স্থানীয় মহিলারা কি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত হতে পারে না?’ বিরক্ত হলেন সোনাতাচা।

‘না, মানে কীরকম কীরকম মনে হচ্ছে।’ ওদের বিজ্ঞাম করতে বলে পুরের যে দলটা হটিতে গেল তাদের ডেকে সোনাতাচা বলে দিলেন ‘তোমরা বাড়িটা পেরিয়ে এমন জায়গায় গিয়ে শেল্টার নেবে যাতে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ তোমাদের দেখতে না পায়। ওই মহিলা মনে হয় ওখানে থাকে না। অতএব বেরিয়ে আসবেই। তোমরা অপেক্ষা করবে। ও বেরলে ফলা করবে দূরত্ব রেখে। দেখে আসবে ও কোথায় থাকে। পুরো ব্যাপারটা যেন একদম শান্তিপূর্ণভাবে হয়।’

ছেলেদুটো মাথা নেড়ে চলে গেল।

বাসুদেবের খোয়াল হল, গতকাল ভোর থেকে সে এই ছেলেরদের সঙ্গে আছে, কিন্তু ওরা কেউ তার সঙ্গে এগিয়ে আসেনি কথা বলতে। অভভ্রান্ত নয়, মিনের

সঙ্গে একটা দূরত্ব রেখে চলেছে। সোনচাচা থাকায় ওদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়নি বাসুদেবের। কিন্তু বাংলাদেশের এই যুবকদের মনে হচ্ছিল ঠিক সৈনিকদের মতো। তাদের নেতা যা বলেছেন তাই নীরবে পালন করছে ওরা।

ছেলেদুটোর একজনের নাম করিম আর একজন জাহিদ। রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ওরা শিশুপুত্রের সাইনবোর্ড লেখা বোর্ডটা দেখে খটপট বাংলাটাকে দেখে নিয়েছিল। দরজা জানলা বন্ধ। ডেতরে লোক আছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না। ওরা হটিতে হটিতে এগিয়ে গেল। বাঁদিকে একটা উঁচু চিবি, পর পর কয়েকটা গাছ। ওরা হটিতে হটিতে যেন প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে যাচ্ছে এই ভঙ্গিতে চিবির কাছে গাছের আড়ালে চলে এল। এখান থেকে বাংলাটা দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু বাগান আর গেট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ গেট থেকে কেউ বের হলে ওদের নজর না এড়িয়ে যাবে না।

আড়ালে দাঁড়িয়ে করিম বলল, 'একটা সিগারেট ধরবে?'

'না। গন্ধ পেয়ে যাবে।' জাহিদ বলল।

'কে গন্ধ পাবে? এখানে তো কেউ নেই।'

'তা হলে ধরা।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে পালা করে দুজনে টান দিতে লাগল। করিম বলল,

'ধর, আমরা এখানে আসার আগে সে চলে গিয়েছে।'

জাহিদ বলল, 'সেই স্কোপ নেই। আফজল ওয়াচ করছিল।'

করিম বলল, 'তুই চিন্তা কর জাহিদ, আমাদের দেশের মধ্যে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা ঘটি তৈরি করে আছে অথচ আমাদের সরকার কিছু বলছে না।'

'সরকার জানলে তো বলবে।'

'বায়, সরকারের জানার দায়িত্ব নেই।'

'একাত্তর সালেই রাজাকারদের যুগ শেষ হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে যারা মার্ডার করেছিল তারা কারা? বাংলাদেশকে ভালবাসে? না। এখনও এদেশে প্রচুর রাজাকার আছে। আমার আবু স্বাধীনতাবুদ্ধে মারা গিয়েছেন। তাঁর বন্ধু, আমাদের পার্শ্বের বাড়িতে থাকে, এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। আজিসান বাড়ি বানিয়েছে। দশ মাস আমেরিকায় থাকে। বঙ্গবন্ধুকে গুলি দেয়। পাবলিকলি কিছু বলে না অশ্রু। সে শাল্যও রাজাকার। এরা সর্বত্র থাকে। পুলিশ আছে, বি ডি আর-এ আছে। নিশ্চয়ই তাদের কিছু লোক রেগুলার টাকা খায় এদের কাছ থেকে। সরকারকে জানায় না।' জাহিদ বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওরা দেখতে পেল একজন মহিলা বাগান দিয়ে হেঁটে গেটের দিকে এসেছে।

ওরা খটপট বেরিয়ে এল রাস্তায়। যেন বেড়াতে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে হটিতে লাগল। মহিলা তখন গেট বন্ধ করে হটা শুরু করেছে। ওরা ওর হাত পনেরো দূরে চলে এসেছিল। পেছনে দুজন যুবক আসছে বোঝামাত্র মহিলার হটটার ধরনই বদলে গেল। তার নিতম্ব পায়ের তালে ওঠানামা করতে লাগল। করিম ও জাহিদ কাছে এসে পড়তেই মহিলা তাকাল। করিম জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে চায়ের

দোকান আছে?'

'আপনারা কি এখানে নতুন?'' মহিলা হাসল।

'হ্যাঁ। বেড়াতে এসেছি।' জাহিদ বলল।

'চায়ের দোকান বাজারের কাছে। দুই মাইল।' মহিলা হটিতে হটিতে বলল।

'অনেক দূর।' করিম বলল।

'আপনারা কেমন লোক? মেয়েমানুষের পেছন পেছন আসতেছেন?'

'পেছনটা যদি ভাল হয় তা হলে আসতে দোষ কী?'' করিম হাসল।

'আপনার কথা যদি লোকে শোনে—।'' মহিলা হাসল।

'আম্হা, যে বাড়িতে গিয়েছিলেন সেখানে রোজ যান?'' জাহিদ জিজ্ঞাসা করল।

'কী অব্যবহার কী কথা? ওখানে আমি কাম করি।'

'কী কাম?'

'পরিচর্য করি, বাসন বাঁধি, দু-চারটা কাপড় কাটি।'

'ওখানে কে কে আছে?'

'বলা নিষেধ।'

'নিষেধ কেন?'

'ও বাংলার কোনও কথা বাইরে বলা নিষেধ।'

'কেন?'

'তা জানি না। চাকরি বিবার সময় সেই কথা হইছিল।'

হঠাৎ করিম গাম্ভা সরাল। বেশ কড়া গলায় বলল, 'এই মাগি, দেখছিস?'

অগ্ন সেখে মহিলার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'এরপরে বলবি বলা নিষেধ?'

'আপনারা—আপনারা—।'' মহিলা কথা বুঁজে পাচ্ছিল না।

জাহিদ দেখল কিছুটা দূরে দুটো লোক কথা বলছে। সে মহিলাকে বলল, 'বাঁচতে চাও যদি ভালদিকে হাটা।'

'এদিকে কেউ থাকে না। চা-বাগান।' মহিলা ককিয়ে উঠল।

ওরা পাড়া দিল না। মহিলাকে নিয়ে সোজা হাজির করল বাংলার যেখানে তাদের দল ছিল। বরষ পেয়ে সোনচাচার সঙ্গে বাসুদেবও নীচে নামল।

সে দেখতে পেল মাঝারি বয়সের ভাল স্বাস্থ্যের একজন মহিলা কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে। তাকে ঘিরে রয়েছে ছেলেরা। ওরা যেতেই একজন মহিলাকে বলল, 'সাহেব যা যা জিজ্ঞাসা করবেন তার জবাব দাও।'

সোনচাচা জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম কী?'

'জিনাত।'

'বাসায় আর কে আছে?'

'আমার বাসায়? স্বপ্তর থাকে সাথে।'

'কেন? স্বামী কোথায় গেল?'

'সে নাই।'

'কী কর তুমি?'

‘আগে দুই বাসায় কাম করতাম এখন ওই এক বাংলাতে করি।’

‘কেন? আর একটা কাজ ছেড়ে দিয়েছে কেন?’

‘আগে দুই বাসায় কাম কইয়া পাইতাম হাজার। এখন ওই এক বাংলা থিকা পাই দেড় হাজার। তারা বলছে আর কুথাও কাম যেন না করি।’

‘কেন?’

‘জানি না।’

‘ওই বাংলার কাজ কীভাবে পেয়েছে?’

‘একজন খবর দিছিল।’

‘কতদিন আছ ওখানে?’

‘ওখানে আমি থাকি না।’ মহিলা প্রতিবাদ করল।

‘আরে না! কতদিন কাজ করছ ওখানে?’ সোনাচাচা সংশোধন করলেন।

‘স্বপ্নের পর থিকা।’

‘তা হলে তো অনেক মাস হয়ে গেল। এখন মন দিয়ে শোনো। ওই বাড়ি সম্পর্কে আমাদের কিছু কথা তুমি বলবে। ওখানে এখন ঠিক কতজন লোক থাকে?’ সোনাচাচা তাকালেন।

মহিলা মাথা নিচু করল। তারপর মাথা নেড়ে নীরবে না বলল।

সোনাচাচা বলল, ‘তোমাকে কথা বলতে হবে।’

‘নিষেধ আছে। ওই বাংলার কোনও কথা বাইরে যদি বলি তাহলে তারা আর কামে রাখবে না।’ মহিলা কাতর গলায় বলল, ‘প্রথম দিনই তারা কথাটা বলছে।’

‘ওরা জানতেই পারবে না। আমরা বাইরে থেকে এসেছি। আজ রাতেই চলে যাব। তুমি আমাদের কী বলছ তা ওরা জানবে কী করে? নির্ভয়ে বলো।’

‘না সাহেব, পাপ হবে।’

‘ওরা আমাদের দেশের শত্রু। ওদের সাহায্য করাই তো পাপ।’

‘কী যে কন! দেশের শত্রু। বি ডি আরের বড় বড় সাহেবরা ওখানে যায়।’

‘কী নাম তাদের?’

‘নাম তো দিগাই নাই।’

‘দেখো জিনাত, তুমি যদি মুখ না খোল তা হলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এই যে ছেলের দের দেখছ এরা তোমাকে মাটিতে পুতে ফেলতে পারে।’

হঠাৎ কান্দতে লাগল জিনাত। কান্দতে কান্দতে জানাল ওই চাকরিটা চলে গেলে সে না খেয়ে মরবে। সকাল বিকেলে দু’খণ্ডের কাজের জন্যে কেউ দেড় হাজার টাকা দেবে না। করিম চূপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার আর নিজেই সামলাতে পারল না, ‘তোমার বয়স তো বেশি নয়, আবার বিয়াসাদি করতেছ না কেন?’

জিনাত মাথা নাড়ে, ‘সবাই চায় মজা মারতে, বিয়ে করবে কে? আপনি করবেন?’

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠল। করিম সরে গেল সেখান থেকে।

১০৬

সোনাচাচা বললেন, ‘তোমার যাতে বিপদ না হয় সেটা আমরা দেখব। তুমি জানো না ওরা কাল সকালের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবে। তুমি গিয়ে কাউকে দেখতে পাবে না।’

‘কী কন আপনি?’

‘ঠিক বলছি।’

‘তাই ওরা কাল আমাদের ছুটি দিছে?’

‘তুমি চেয়েছিলে ছুটি?’

‘না। মেমসাহেব বলল কাল তোর ছুটি।’

‘তা হলে বুঝতেই পারছ। মেমসাহেব বাংলা বলে?’

‘হ্যাঁ। সে তো বাঙালি।’

‘এই যে শুনলাম আরাকানের মেয়ে।’

‘কী জানি। পাহাড়ের বাঙালিরা যেমন হয়।’

‘মেমসাহেব ছাড়া আর কতজন লোক থাকে?’

‘এক দুই—চারজন।’

‘তারা কারা?’

চোখ বন্ধ করল জিনাত, ‘বড় সাহেব, দুজন লোক, ওরা চৌকিদার, রান্না যে করে সেই গাড়ি চালায়। আর মেমসাহেব তো আছেই।’

বাসুদেব চূপচাপ শুনছিল একতরফ। এবার উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘বড়সাহেব আজ এখন ওখানে আছে?’

অবাক হয়ে তাকে দেখে জিনাত মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

‘তোমার বড়সাহেবের নাম কী?’ সোনাচাচা জিজ্ঞাসা করলেন।

‘জানি না। সাহেবদের নামে আমাদের তো কোনও কাম নাই।’

‘বাংলায় তিনি কী করেন?’

‘বই পড়েন। পেপার পড়েন। আর যখন দেখি না তখন মুন্সি নিজের ঘরে আছেন। সেখানে গিয়ে বোধহয় কথা বলেন।’

‘ক’র সঙ্গে?’

‘জানি না।’

‘তার মানে ওই ঘরে আর একজন থাকে?’

‘তাকে দেখি নাই।’

‘তা হলে মেমসাহেবকে নিয়ে পাঁচজন নয়, ছয়জন ওই বাংলাতে থাকে।’

‘হইতে পারে।’

‘তা তোমার মেমসাহেব মানুষটা কেমন?’

‘ভাল। গলার আওয়াজ বড় মিঠা।’ হাসল জিনাত।

‘ওই বাংলাতে ঢোকার দরজা কটা?’

‘দুটা। একটা সামনে থিকা আর একটা পিছনে।’

‘ঠিক আছে জিনাত। এইসব খবরের জন্যে তোমাকে পাঁচশো টাকা দিচ্ছি।’ পকেট থেকে সোনাচাচা টাকা বের করে ওনে নোটগুলো ওর হাতে দিলেন।

‘এইবার তোমার ঠিকানাটা বলো।’

‘জান?’

‘তোমার বুড়ো স্বপ্নের একা বাড়িতে আছে। সেটা ঠিক না। ওঁকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি। কাল সকাল পর্যন্ত তোমরা এখানেই থাকবে।’

‘না। আমি বাসায় যাব।’ জিনাত সোজা হল।

‘কথার অবোধা হলো না। এখানে থাকলে কেউ তোমাকে অসম্মান করবে না। কিন্তু কাল সকালের আগে আমরা তোমাকে ছাড়তে পারি না।’ সোনাচাচা উঠে এলেন।

দুপুরের পর সোনাচাচা আর একবার জিনাতের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশটার ম্যাপ আঁকলেন। ইতিমধ্যে জিনাতের স্বপ্নেরকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ছেলের বউকে দেখে বুড়ো বেশ অবাক। কেন তাকে ডাকা হল তা জানার পর একটিও কথা বলেনি। দুপুরের খাবার খেয়ে ওপরের ঘরে শুয়ে পড়ছে। জিনাতও সেখানে আছে। ছেলেরা একটা রসিকতা করার সুযোগ পেয়ে গেছে করিমের সঙ্গে। সে বেচারি কিছুতেই দোতলায় উঠছে না।

কুদুসসাহেব সারাদিনে এই তল্লাটে আসেননি। চা-বাগান আর গাছগাছালিতে জায়গাটা এত নির্জন যে এতজন লোকের অবস্থান কেউ জানতে পারছে কিনা সম্ভব। কুদুসসাহেব এলেন সন্দের পরে। পায়ে হেঁটে। সোনাচাচাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু বলে তিনি বাসুদেবের কাছে এলেন, ‘আরে মহাই, তইইবনে তো! আপনার রিপোর্ট আমরা রেডিয়ারে শুনি। টিভিতেও আপনার নাম বলে।’

‘এখানে বিদেশের টিভি দেখতে পান?’ বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

‘আমার নিজস্ব ডিসঅ্যাক্টনা আছে। আমার সৌভাগ্য যে আপনি আসছেন। তবে একটা রিকোর্ডেস্ট; এখানে কোনও অ্যাকশনে আপনার যাওয়া ঠিক না।’ কুদুসসাহেব গলা নামালেন, ‘প্রথম কথা, আপনি বিদেশি। দ্বিতীয় কথা, আপনার সাথে বৈধ কাগজ নাই।’

বাসুদেব অশ্রুজলে পড়ল, ‘তা হলে?’

‘আপনি বোকার চেষ্টা করুন। যদি কেউ খুন হয় অথবা যদি কাউরে হুমসিটালাইজ করতে হয় তা হলে পুলিশ এনকুয়ারি করবই। আর তখন তারা আপনার কথা জানলে কেসটা অন্যরকম হইতে পারে।’

কুদুসসাহেবকে সমর্থন করলেন সোনাচাচা, ‘উনি ঠিকই বলছেন বাসুদেব। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এখানে কোনও অবৈধ কাজকর্ম হবে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। সেটা অন্যায় নয়। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।’

‘কিন্তু আমি না থাকলে বিখণ্ডিতকে তো ট্যাকল করতে পারবেন না।’ বাসুদেব বলল।

‘পারব। তোমার ওই টিকিটভির সাহায্য ছাড়াই পারব।’ সোনাচাচা বললেন।

কুদুসসাহেব ফিরে গেলেন তার বাংলোয়। নিজের মোবাইল নাখার দিয়ে গেলেন। সোনাচাচা দলের কয়েকজনকে নিয়ে মিটিং করলেন। ঠিক রাত নটার

সময় ওই বাংলোর দুদিক ভতার করা হবে। কীভাবে আক্রমণ করা হবে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘দেখো তো, ওই ঘরে একটা ফোন আছে, তার নাখার কত?’

বাসুদেব দেখল। ফোনাটা চালু আছে। সে নাখারটা বলল। সোনাচাচা দ্রুত নিজের মোবাইলে নাখার তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার সঙ্গে দশরথ দেববর্মার মোবাইল আছে?’

‘হ্যাঁ। তবে সেদিন থেকেই অফ করে রেখেছি।’

‘ঠিক করেছ। এবার আমার এই নাখারে ভূমি কল করো তো।’ নাখারটা বললেন তিনি। মোবাইলটা অন করে নাখারগুলো টিপতেই সোনাচাচার মোবাইলে রিং শুরু হল। ওটাকে অফ করে তিনি বললেন, ‘তা হলে আমাদের দুজনের মোবাইলেই নাখারটা উঠে গেল। তোমার কাজ হবে অ্যাকশন শুরু হওয়ার সময় থেকে এই ঘরে অপেক্ষা করা। আমি কোনও সমস্যায় পড়লেই তোমাকে ফোন করব। হয় মোবাইলে নয় ওই ফোনে। আমরা সবসময় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখব। আমাদের দুজন ছেলে নীচে পায়ারায় থাকবে। যদি কোনও গোলমাল হয়, যদি পরিকল্পনা ভেঙে যায় অথবা আমরা ফিরে না আসতে পারি তা হলে ওরা তোমাকে নিয়ে আজ রাতেরই এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। সেরকম স্বপ্ন পেলে একমুহূর্তও এখানে থেকে না। অর্থাৎ ভূমি অ্যাকশনে যাক না বটে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা হেডকোয়ার্টার্সে বসে মিটিং করছ।’

মাথা নড়ল বাসুদেব। হঠাৎ তার খোয়াল হল বিখণ্ডিত দেববর্মা যদি সত্যি এখানে থাকে তা হলে সে গেলে আর একটা সমস্যা হত। লোকটা হয়তো তাকে চিনতে পারত। পারলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যেতে পারত। সে যেতে পারছে না জানার পর একটু মন রাখাণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই ব্যাপারটা ভাবার পর সেটা কমে গেল। সোনাচাচার ওপর তার গভীর আস্থা জন্মেছে।

রাত আটটার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল। এমনিতেই নির্জন জায়গা, রাত আটটাতেই মনে হচ্ছে গভীর রাত। দুবে চা-বাগানের ফ্যান্সির বাংলোর টিনটিমে আলো ছাড়া কোথাও কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই। কিংবা ডাকছে একটানা। সাতের আটটা নাগাণ ওরা বেরিয়ে গেল। সেট অবধি গিয়ে ওদের বিদায় দিয়ে বাসুদেব চলে এল দোতলায়। দুটো ছেলে রয়ে গেল নীচে। তাদের উর্ধ্বদে গামছা জড়ানো। অর্থাৎ ওরা সশস্ত্র।

ঘরের দিকে যেতেই সে সেন্সল জিনাত দাঁড়িয়ে আছে রেলিং-এর পাশে। এখানে এখন হারিয়েশেন ছাড়া কেউ আছে। জিনাত বলল, ‘আপনি যান নাই?’

‘কোথায়?’ বাসুদেব বিরক্ত হল।

‘ওই, যেখানে ওরা যায়।’

‘তোমার কী দরকার? যাও, ওই ঘরে যাও।’

‘অবুজ! সারা সময় স্বপ্নের মুখের সামনে বইস্যা থাকা যায়?’

‘তা হলে চুপ করে থাকো। নীচে নামার চেষ্টা করো না।’

‘একটা কথা কই?’

‘কী কথা?’

‘আপনারা কারা?’

‘তোমার মতোই মানুষ। যাও, ভেতরে যাও।’ দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকে পড়ল বাসুদেব। এখন কোনোর সামনে বসে থাক।

পায়ে হেঁটে ওরা বাড়িটার চারপাশে চলে এল। এরকম নির্জন আধাপাহাড়ি জায়গায় বাংলাগুলো যেমন হয় এটিও তেমনি। সামনে বাগান, একতলা-দোতলা মিলে অনেকগুলো ঘর। সব কটা ঘরের জানলা দরজা এখন বন্ধ। কিন্তু কাচের জানলা দিয়ে ভেতরের আলো বাইরে আসছে। অন্ধকারে সোনাভাইয়ের নির্দেশে ছেলেরা পজিশন নিল। পেছনের দরজার খুব কাছে চলে গেল তিনজন। কেউ ওই দরজা খুলে বেরুতে চাইলেই ওরা গুলি চালাবে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গুলি যেন পালক্য করে চালাবে।

সোনাভাই এবং আরও তিনজন গেট খুলে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খোলা গেট দিয়ে ঢুকে গেল বাকিরা। বাংলাটাটার প্রায় পায়ে সঁটে রইল তারা। সোনাভাই বোতাম টিপে বেল বাজালেন। দ্বিতীয়বারে ভেতর থেকে গলা পাওয়া গেল। পরিচয় জানতে চাইছে।

‘কর্ণেল হবিবুমা পাঠিয়েছেন। জরুরি।’ সোনাভাই গলা তুললেন।

করেক সেকেন্ডে চুপচাপ। তারপর আবার জিজ্ঞাসা, ‘কোন কর্নেল? বি ডি আরের?’

‘হ্যাঁ।’ দাঁতে দাঁত চাপলেন সোনাভাই।

দরজাটা খুলে গেল। স্বাস্থ্যবান একটি লোককে দেখামাত্র করিম খাঁপিরে পড়ল। সে কিছু বোঝার আগেই তাকে মাটিতে ফেলে বেঁধে ফেলল ওরা। মুখ বাঁধল যাতে শব্দ করতে না পারে।

‘কে এসেছে জামাতিয়া?’ গলাটা এগিয়ে আসছিল।

এই ঘরে ঢুকতেই লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল। চারটে রিভলভার তার দিকে তাক করা আছে। সে বাঁরে ধীরে হাত ওপরে তুলল। জাহিদ এগিয়ে গিয়ে ওর যাড়ে একটা রক্তা মারতেই লোকটা কটা কলাগাছের মতো নীচে পড়ে গেল। লোকটাকে বাঁধা হল চটপট। তারপর দ্বিতীয় ঘরের দিকে পা বাড়াল ওরা। একজন মহিলা গান গাইছে। টিভি বা রেডিওতে নয়। গান বাংলা ভাষায় নয়। মহিলাকে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ গান থেমে গেল এবং তাঁর গলায় চিকরার শোনা গেল, ‘জামাতিয়া!’

সোনাভাই যতটা সম্ভব গলায় সয়ম এনে বললেন, ‘জি!’

‘জি? তুমি বাংলাদেশের মানুষ নাবি?’ জি।’ খুব হাসলেন মহিলা, ‘সোনো, অ্যাঁই শুনতেছে, জামাতিয়াও জি বলতেছে।’

‘এখানে শুনছে। ভাল। ডাকো ওরে।’

‘জামাতিয়া।’ মহিলা ডাকলেন।

‘বলেন?’

‘বেল বাজাইল কে?’

‘ক্যান্টেন হবিবুমা আসছেন। সাহেবের বলেন।’ গলাটা নিচুতে রাখলেন সোনাভাই, কথাগুলো বলেই পজিশন নিয়ে নিলেন ওঁরা। দরজার দুপাশে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন যাতে কেউ ঢুকলেই ওরা খাঁপিরে পড়তে পারে। কিন্তু যিনি ঢুকলেন তাঁর কথা ভাবেননি সোনাভাই। জিন্স আর শার্ট পরা এক মহিলা ভেতরে ঢুকতেই করিম ও জাহিদ তাঁর মুখ চেপে ধরল।

মহিলা নিজেই ছাড়বার চেষ্টা করলেন কিন্তু ওরা সুযোগ দিল না। মহিলার মুখ এবং হাত পা বেঁধে ফেলা হল। মেঝেতে শুয়ে দেওয়া হল তাঁকে। সোনাভাই দেখল মহিলার চোখ বিস্ময়িত। তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না।

সোনাভাই রিভলভারটা মহিলার মাথার চেপে ধরতেই তিনি সজোরে মাথা নাড়তে লাগলেন। মৃত্যুভয় তাঁর মুখ চোখে ফুটে উঠল। সোনাভাই বললেন, ‘আপনাকে মারব না যদি আপনি আপনার সাহেবকে এখানে ডাকেন। খুব নর্মাল গলায় ডাকবেন। কি রান্নি?’

মহিলা মাথা নাড়লেন যার মানে বোঝা গেল না। সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ও, তা হলে আপনি ধরতে চাইছেন?’

মহিলা মাথা নেড়ে অস্বীকার জানালেন।

‘তা হলে?’

সমস্যা পড়লেন সোনাভাই। ওঁর বক্তব্য শুনতে হলে মুখ খুলে দিতে হয়। সেটা খুব খুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু মহিলার ডাক শুনলে ওঁর স্বামী নিশ্চয়ই কোনও সন্দেহ না করে এই ঘরে আসতেন। না খুঁকি নেওয়া যাবে না। সঙ্গীদের ইশারা করে হুড়মুড় করে সোনাভাটা ভেতরে ঢুকে পড়লেন। বড় খাওয়ার ঘর। বাকিকে সিঁড়ি ওপরে চলে গিয়েছে। ওপর থেকে গলা ভেসে এল, ‘ডার্লিং!’

সোনাভাই দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরের ঘরে যেতেই মুখোমুখি হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার উল্টিয়ে ধরতেই লোকটি বুটো হাত মাথার ওপরে তুলল। করিম তার কাঁজ চটপট শেষ করতেই গুলির আওয়াজ ভেসে এল। সোনাভাই দেখলেন জাহিদ মাটিতে শুয়ে পড়ে রিভলভারের ট্রিগার টিপল। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের দরজার সামনে দাঁড়ানো একটা লোক যে এই মুহূর্তে গুলি ছুড়েছিল খপ করে গড়ে ধীর হয়ে গেল।

সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, ‘জাহিদ?’

‘অমি ঠিক আছি সোনাভাই। এক ইঞ্চি দূর দিয়ে গুলি গেল।’ জাহিদ হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। ভতকপে করিম লোকটাকে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু হিসাব মিলছিল না। সোনাভাইয়ের মতে আর একজন লোকের এখানে থাকার কথা। জানাত বলেছে বিখিজিত দেববর্মা ওপরের ঘরে বসে কারও সঙ্গে কথা বলে।

পুরো বাংলাটা খুঁজে দেখা হল। গুলির শব্দ শুনে বাইরে থেকে ছেলেরা একে একে ভেতরে চলে এল। না, আর কেউ এখানে নেই।

নীচের বড় ঘরটাতে নিয়ে আসা হল গৃহকর্তাকে। চেয়ারে বসিয়ে সোনাভাই আর একটা চেয়ার টেনে সামনে-বসলেন। ওঁর নির্দেশে লোকটির মুখের বাঁধন

খুলে খেওয়া হ'ল।

সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?'

লোকটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'তার আগে আপনাদের আইডেন্টিটি জানতে চাই।' লোকটি কথা বলল পরিষ্কার ইংরেজিতে।

'আমরা পুলিশ। কেন্দ্রীয় পুলিশ।'

'পুলিশ—!' লোকটি মেনে খুব অবাক হল।

'হ্যাঁ। ঢাকা থেকে এসেছি। আমাদের কাছে খবর আছে এই বাড়িতে কিছু বেআইনি কারবার হচ্ছে।'

'ভুল। ভুল খবর। আমরা এখানে কোনও বেআইনি কাজ করছি না।'

'আপনি বাংলাদেশের নাগরিক? সারাসরি প্রশ্ন করলেন সোনাভাই।

'না, মানে, আমরা নাগরিকদের জন্যে আবেদন করব ঠিক করেছি।'

'তার মানে আপনারা ভারতীয় নাগরিক, বেআইনিভাবে এখানে আছেন।'

'আমরা বাধ্য হয়েছি এখানে চলে আসতে। অবশ্য এর জন্যে আপনারদের বি ডি আর-এর কাছে আবেদন করেছিলাম এবং ওরা আমাদের এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।'

'বি ডি আর তো অনুমতি দেওয়ার মালিক নয়। ওরা কি গির্নিত অনুমতি দিয়েছে?'

'না। দুজন অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।'

'তাদের নাম জানতে পারি?'

'মুগ্ধিত, আমার পক্ষে নাম বলা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন স্যার।'

'হ্যাঁ। চমৎকার! বি ডি আর-এর দুজন অফিসারকে আপনি তুষ্ট করবেন আর আমরা বঞ্চিত হব? এটা কি মেনে নেওয়া যায়, বলুন?'

আশ্চর্য, আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি কেন? আমি যখন ওই দুজনকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছি আপনার সঙ্গেও বন্ধু করতাম। তা হলে এইভাবে আপনারদের আসতে হত না। আপনারা আমার প্রিয় কুক কাম ড্রাইভারকে মেরে ফেলেছেন। ও বেচারার মারা যেত না।' উত্তেজিত হল লোকটি।

'গুলি আপনার লোক প্রথমে চালিয়েছিল। গলা ভুলে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। কিন্তু এখনও আপনি আপনার নাম জানালেন না।'

'আমার নাম ক্ষেত্রজয়া।'

সোনাভাই উঠলেন। খুব সাধারণভাবে হেঁটে লোকটির কাছে গিয়ে সজোরে চক্ক মারলেন, 'আমি মিথ্যা কথা একদম সহ্য করতে পারি না। আমি ভদ্রভাবে কথা বলছিলাম, আপনি আমাকে উত্তেজিত করছেন।'

লোকটি সামান্য হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দ্রুত সামলে নিল, 'আপনারা কী চান?'

'কী চাই বলে আপনার মনে হচ্ছে?'

'টাকা। কত টাকা চান?'

'বি ডি আর-এর ওই দুই অফিসারকে কত দেন?'

'এক লাখ করে, দুজনকে।'

'শুধু এখানে আপনারা করেকজন থাকবেন তার জন্যে মাসে দুই লাখ কেউ খরচ করে না। আপনার বাকি লোকজন কোথায় আছে?'

'এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে।'

'তারা কারা?'

'ভারত সরকার যাদের ওপর অকথা নির্বাহন করেছে, সেখানে থাকলে সরকার যাদের গুলি করে মারত কোনও আইনের পরোয়া না করে তারাই আমার সঙ্গে সীমাহীনভাবে এগারে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ওখানে ওরা ক্যাম্প করে আছে। খুব শিগগির আমরা আপনারদের সরকারের কাছে আবেদন জানাব পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের জন্যে।'

'কতজন আছে ওখানে?'

'চল্লিশজন।'

'বাস, ওই একটাই ক্যাম্প?'

'আর একটা ট্রানজিট ক্যাম্প আছে বর্তারের কাছাকাছি যাতে কেউ পালিয়ে এসে বিপদে না পড়ে, তাদের সাহায্য করার জন্যে, সেখানে চার-পাঁচজনের বেশি থাকে না।'

'আপনাদের ওপর ভারত সরকার কেন অসন্তুষ্ট?'

'আমরা আমাদের মাটির দখল চেয়েছিলাম। আমাদের মাটি অন্য লোক ভোগ করুক তা চাইনি। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। তাই—!'

'এবার আপনার নাম বলুন।'

'আমার নামে আপনার কী সরকার? আপনার টাকা পেলেই তো হল!'

'কত টাকা দেবেন?'

'ওরা এক করে নিলে, আপনিও তাই নেবেন।'

'মাত্র এক লাখ টাকার জন্যে টাকা থেকে কেউ এত দূরে আসে? আপনি কি পাগল? তা ছাড়া আমি মাহুলি সিস্টেমে বিশ্বাস করি না। আপনারা তো সবখানে কিডন্যাপ করে যাচ্ছেন আর লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করেন। আমার এক কোটি চাই।' সোনাভাই বললেন।

'অসম্ভব। এই মুহূর্তে আমার কাছে অত টাকা নেই।'

'কত আছে?'

'দুই লাখ।'

'এর মধ্যে তো আপনার হাতে পঁচিশ লাখ টাকা এসে যাওয়ার কথা।'

'লোকটি অবাক হয়ে তাকাল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

'আগরতলার খবর তো ঢাকাতেও আসে।'

'ও, না, আসেনি। এখনও আসেনি।'

'আপনার নাম বললেন না এখনও।'

‘আপনি এত জানেন আর আমার নাম জানেন না।’

‘আপনার মুখে শুনে কনফার্মড হতে চাই।’

‘বিশ্বজিত সেববর্মা।’

‘সেববর্মা?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি মনে করেন না যে ভারতে কোনও ক্রাইম করে এসেছেন?’

‘না।’

‘শুনুন মশাই, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এখানে এসেছি। ডাক্তার সৌমিত্র এখন কোথায়?’

‘কে ডাক্তার সৌমিত্র?’

‘আপনি যেন কখনও নাম শোনেননি?’

‘না। এরকম নাম কখনও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না।’

‘একে আপনারা কিডন্যাপ করেছেন। এর মুক্তিপণ হিসেবে পঁচিশ লক্ষ টাকা চেয়েছেন।’

‘একদম বাজে কথা। হয়তো অন্য কোনও দল করেছে, আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।’

সেনাভাই তাকালেন। তারপর চলে এলেন বাইরের ঘরে। মোবাইলের একটি বোতাম দুবার টিপতেই ওপাশে রিং হল। বাসুদেবের গলায় উত্তেজনা বোঝা যাচ্ছে, ‘হ্যাঁ। হ্যালো।’

‘অপারেশন সাকসেসফুল। ওদের একজন মারা গিয়েছে।’

‘আমাদের?’

‘সব ঠিক আছে। কিছু বিশ্বজিত বলছে সৌমিত্র ডাক্তারের নামই শোনেনি। কী করব?’

‘মিথ্যে কথা বলছে। মিথ্যে কথা।’

‘কিন্তু কীভাবে প্রমাণ করব ও মিথ্যে বলছে?’

‘আপনি ওর বাবার মোবাইল নাথারটা বলে বলুন, দশরথ সেববর্মা স্বীকার করেছে।’

‘ভাতও যদি রাজি না হয়?’

‘তা হলে ওই নাথারে ফোন করে আমাকে ভিজাসা করুন। আমি ওর বাবার হয়ে জবাব দেব।’

‘থ্যাক ইউ।’

মোবাইল অফ করে আবার বিশ্বজিতের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সেনাচাচা।

‘দশরথ সেববর্মার নাম আপনি শুনেছেন?’

‘কপালে ভাঁজ পড়ল বিশ্বজিতের। মাথা নড়ল, হ্যাঁ।’

‘ওড। দশরথ বলেছেন আপনার দল সৌমিত্র ডাক্তারকে কিডন্যাপ করেছে।’

‘মিথ্যে কথা। তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই। সে সি পি এম করে, আমার অ্যাণ্টি পার্টি। এরকম কথা তার মুখ থেকে বেরুতেই পারে না।’ খুব জোর

১১৪

দিয়ে বলল বিশ্বজিত।

‘কিন্তু বলেছেন। আপনি তার সঙ্গে কথা বলবেন?’

‘কী করে বলব? কোথায় আছে তাই আমি জানি না।’

‘আমি আপনাকে সাহায্য করছি।’ সেনাচাচা মোবাইল নাথারটা নিজের সেট অফ করে দেখে বললেন। শুনে মুখ নিচু করল বিশ্বজিত। তারপর বলল, ‘বাংলাদেশের পুলিশ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।’

‘তা হলে স্বীকার করছেন?’

‘উপায় কী?’

‘ডাক্তার এখন কোথায়?’

‘ওকে আপনারদের কী দরকার?’

‘বললাম তো, প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে আমরা এখানে এসেছি।’ সেনাভাই বললেন, ‘ওকে কি ওই ক্যাম্পে রেখেছেন আপনারা?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওকে ছেড়ে দিন।’

‘তার মানে?’

‘সৌমিত্র ডাক্তারকে ছেড়ে দিতে হবে।’

‘অসম্ভব। আমার ধারা সম্ভব নয়।’

‘কেন?’

‘আমি একাই সব নয়। আমাদের দলের অন্য নেতারা এরজন্যে কৈফিয়ত চাইবে।’

‘আপনি দলের সেক্রেটারি। আপনার কমতা প্রয়োগ করুন।’

টিক সেইসময় বাইরের রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ হল। গাড়িটা ধামল। সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে দৌড়ে এল ভেতরে, ‘স্যার। দুজন লোক গাড়ি থেকে নামছে।’

সেনাভাই-এর ইঙ্গিতে বিশ্বজিতের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। বাইরের ঘরে এবং মাঝখানের ঘরে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে তুলে নিয়ে আসা হল ভেতরে। বেল বাজল।

সেনাভাই সাড়া দিলেন, ‘কে?’

‘আমরা। কুইক।’

‘কে আপনারা?’

‘আন্দর্ভ। নতুন লোক নাকি! একজন বিরক্ত হল।

দ্বিতীয়জন জবাব দিল, ‘ফ্রেড।’

ছেলেরা সব তৈরি ছিল। সেনাভাই দরজা খুলতে লোকদুটো যেন নিজের বাড়িতে ঢুকছে এমন ভঙ্গিতে ভেতরে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়ে পড়ল ছেলেরা। কিন্তু ওদের কবজা করতে সময় লাগল। মাথায় আঘাত করতে হল। দুজনেই সশস্ত্র। সিভিল ড্রেসে থাকলেও সামরিক ট্রেনিং আছে বলে বোঝা যাচ্ছিল।

লোকদুটো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তাদের বন্দি করে সেনাভাই বললেন,

১১৫

‘গাড়িতে কে কে আছে দেখে ব্যবস্থা নাও। শোনো, পালাতে যাতে না পারে।’

তিনি মোবাইল অন করলেন, ‘স্বীকার করছেন। এর মধ্যে দুজন গেস্ট এসেছে এ বাড়িতে। আমি ওকে বাধ্য করছি ডাক্তারকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু ও যদি ক্যাম্পে যেতে চায় তা হলে কী বলব?’

‘ফোনে অর্ডার দিতে বলুন। আমার মনে হয় ওর কাছে অয়ারলেস সেট আছে। এর আগে একজনের মুক্তিপণ হিসেবে টাকার সঙ্গে অয়ারলেস সেট নিয়েছিল ও।’ বাসুদেব বলল।

‘ঠিক হয়।’

ফিরে এলেন সোনাভাই। বিখজিতের মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। সোনাভাই তাকে বললেন, ‘আপনার দুজন গেস্ট এখন আমাদের দখলে।’

‘সর্বনাশ! ওরা অফিসার। করেছেন কী?’

‘আমরা ঠিকই করেছি। বিশ্বাসঘাতকদের কোনও জাতিগোষ্ঠী নেই বাংলাদেশের নিরাপত্তাবাহিনীতে। যাক গে, আপনি ফোনে ওদের অর্ডার দিন ডাক্তারকে ছেড়ে দিতে।’ সোনাভাই বললেন।

‘আমি তো বললাম, আমার একার কোনও ক্ষমতা নেই।’ মাথা নাড়ল বিখজিত।

‘আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। এই কথা শোনার পর আমি আপনাকে প্রচণ্ড যত্নগা দেব তা জানেন।’

‘সত্যি কথা বলুন তো, কে আপনাদের পাঠিয়েছে?’

‘আমার কথা জেনে আপনার কোনও লাভ নেই। কোন কল্পনা।’

‘ওখানে ফোন নেই।’

‘ফোন নেই মানে? এ সময় কেউ মোবাইল রাখে না বলে বিশ্বাস করতে বলছেন?’

‘হ্যাঁ। যার কাছে ছিল তিনি এখন অন্য জায়গায় আছেন।’

‘তা হলে?’

‘আপনার কুশা শুনে যদি ডাক্তারকে মুক্তি দিতে হয় তা হলে আমার ওখানে যাওয়া দরকার।’

‘আপনার যেতে হবে না। জায়গাটা ক্রোধায় বন্ধন।’

‘আপনারা যাবেন?’ অজুত হাসল বিখজিত।

‘যাব।’

‘বেশ। কবে যাবেন?’ খুব নিশ্চিত দেখাল লোকটাকে।

‘আপনি তা হলে চিঠি লিখে দিন।’

‘নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই লিখব।’ হাসল বিখজিত।

ওর হাত খুলে দেওয়া হল। কাগজ কলমের ব্যবস্থা হল। সোনাভাই ভেতরের ঘরে এলেন। মোবাইল চালু করলেন, ‘ও বলছে ওখানে কোনও ফোন নেই। চিঠি লিখে বিচ্ছে, সেই চিঠি নিয়ে আমরা যাচ্ছি।’

‘কেন?’ বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

১১৬

‘ডাক্তারকে নিয়ে আসতে। ক্যাম্পে আছে বলে স্বীকার করেছে।’

‘না না। কখনও না। ওর দলবলের কাছে আধুনিক অস্ত্র আছে। ওদের সংখ্যাও অনেক। আপনারদের বিশেষ ট্রেনে দিচ্ছে লোকটা। কোন না থাক, অয়ারলেস আছে ওর কাছে। শোঁজ করুন।’ বলতে বলতে খুব আপগোশ হাঙ্গিল বাসুদেবের। সে যদি ওখানে থাকতে পারত।

‘ঠিক আছে।’ মোবাইল অফ করে ভেতরে এলেন সোনাভাই। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনার সঙ্গে ক্যাম্পের লোকজন বাঁচবে যোগাযোগ করে?’

‘খুব অসুবিধে হয়। দরকার হলে কেউ আসে।’

‘আপনি যদি যোগাযোগ করতে চান?’

‘টেলিফোনে ওকে বলে দিই। কিন্তু ও চলে গিয়ে সমস্যা হয়েছে।’ বিখজিত বলল, ‘আমার ক্রীকে এখার ছেড়ে দিন। ওকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন?’

বিখজিতকে আবার নির্বাচন করে দেওয়া হল। ভদ্রমহিলাকে বাঁধন মুক্ত করে দিতে তিনি কোনওমতে উঠে বসলেন। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন বোকাই যাচ্ছিল। সোনাভাই তার কাছে গেলেন, ‘বিখজিত ক্যাম্পের সঙ্গে আজ সকালেও কথা বলেছেন বলে জানি। উনি মিথ্যা বলছেন। আপনি যদি সত্যি না বলেন তা হলে আমি আপনার বাঁচতে পারব না।’

‘কী বলব?’ বিভ্রান্ত করলেন মহিলা।

‘কীভাবে কথা বলতেন?’

মহিলা বিখজিতের দিকে তাকালেন। ক্ষমতাবান নেতাকে মাথা ঝুঁকিয়ে যদি অবস্থায় বসে থাকতে দেখে আরও ঘাবড়ে গেলেন। সোনাভাচার আর সময় নষ্ট করলেন না, ‘উঠুন। উঠে বসুন।’

ভদ্রমহিলা কোনওমতে উঠে দাঁড়ালেন।

‘কেন ঘরে অয়ারলেস আছে?’

ভদ্রমহিলা বিখজিতের দিকে তাকালেন। তার মাথা খেন আরও খুঁকে পড়েছে।

‘কী হল?’ প্রচণ্ড ধমক দিলেন সোনাভাই।

এবার ভদ্রমহিলা এগোলেন। সিঁড়ি দিয়ে দোতলার ঘরে ঢুকলেন। তাকে অনুসরণ করলেন সোনাভাই।

এ ঘরে কেউ নেই। ঘর ভর্তি শুধু ফার্নিচার। তার এক কোনায় গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মহিলা। একটা কাঠের বাস। বাসের দরজাটা খুলতেই সেটাকে সেখতে পেলেন সোনাভাই। বিদেশে তৈরি খুব শক্তিশালী অয়ারলেস সেট।

সোনাভাইয়ের নির্দেশে বিখজিতকে ওপরে তুলে আনা হল। সোনাভাই বললেন, ‘এসব ফোনে আপনি যে মিথ্যা বলবেন তা জানা ছিল। সেজন্যে আপনাকে আমি কিছু বলছি না। অনুন বিখজিত, আমি চাই আপনি এক্ষুনি আপনার ক্যাম্পকে নির্দেশ দিন সৌমিত্র ডাক্তারকে ছেড়ে দিতে। কোনওরকম চালাকির চেষ্টা করলে আপনাকে মেরে ফেলতে আমি একটুও দ্বিধা করব না।’ বিখজিতের হাত ও মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল।

‘ডাক্তার আমার প্রধান ক্যাম্পে নেই।’
 ‘যেখানে আছে সেখানেই আদেশ জানিয়ে দিন।’
 ‘তু খু হেডে দিলে যদি ফিরতে না পারে তা হলে আমি কিছু দায়ী নই।’
 বিশ্বজিত বলল।

‘ওকে আগরতলায় পৌঁছে দিতে হবে।’
 ‘এ অসম্ভব। আমি বড়জোর কর্তারটা পার করে দিতে পারি।’
 সেনাভাই আবার মুশকিলে পড়লেন। সীমান্ত পেরিয়ে ডাক্তার যখন আগরতলায় যাবে তখন যদি আবার তাকে ওয়া ধরে নিয়ে যায়? ওয়া না ধরুক, অন্য কোনও দলও তো একই কার্য করতে পারে। তিনি বললেন, ‘ওকে আপনারা নিয়ে এসেছেন, ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আপনারাদের নিতে হবে।’

বিশ্বজিত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনারা ব্যাংক?’
 ‘কললাম তো পুলিশ।’
 ‘এত খবর কী করে পেলেন?’
 ‘যা বলছি তাই করলাম।’
 ‘বেশ। করছি। আপনারাদের সাহায্য আমাদের দরকার বলেই করছি। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।’

‘শর্ত? আপনার?’
 ‘হ্যাঁ। আমার বাবাকে চকিশ দফটার মধ্যে গ্রামে ফিরিয়ে দিতে হবে।’
 সেনাভায়া মাথা নাড়লেন, ‘বেশ। তাই হলে।’
 ‘এটা কিন্তু ভয়ালোকের চুক্তি।’ বিশ্বজিত বলল।
 ‘নির্ন, শুরু করুন।’

‘বিশ্বজিত অয়ারলেস সেটা চালু করল। কয়েকটা বোতাম টেপার পর বলা শুরু করল, ‘হ্যালো! হ্যালো! চেল স্পিকিং, চেল স্পিকিং। হ্যালো হ্যালো।’
 এবার ওদিক থেকে গলা শোনা গেল, ‘টাইগার সেডেন, ওভার? টাইগার সেডেন, ওভার।’

বিশ্বজিত বলল, ‘চেল টু টাইগার সেডেন, ওভার।’
 ‘ক্যারি অন। ওভার।’ ওদিকের গলা।
 ‘রিসিভ ডব্লিউ ইমিডিয়েটলি। রিসিভ ডব্লিউ। ওভার।’
 ‘ওভার ইউ সিয়ার চেল? ওভার।’
 ‘ইয়েস। আন্ত কে টু এসকট হিম আপটু আন্ডাউয়া রোড নিয়ার আপারতলা। ওভার।’ সেটা বন্ধ করে দিল বিশ্বজিত।

সেনাভাই বললেন, ‘আপনাকে আমি বিশ্বাস করছি না। ডাক্তার বর্তার পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। আপনারাদেরও আমরা বন্দি করে রাখতে বাধ্য হচ্ছি।’

‘কিন্তু এরকম কথা ছিল না।’ বিশ্বজিত প্রতিবাদ করল, ‘আপনাকে তো আমি বলেছি টাকাটা দেব। সেটা নিয়ে চলে যান।’
 ‘তাই? সেনাভাই হাসলেন।

বিশ্বজিতের নির্দেশে মহিলা একটা সুটকেস বয়ে নিয়ে এলেন। বিশ্বজিত বলল, ‘ওর মধ্যে দু লক্ষ ভারতীয় টাকা আছে। নিয়ে যান।’
 ‘এরকম সুটকেস আর কটা আছে?’
 ‘না নেই।’
 সেনাভাই ইঙ্গিত করতে করিম চুকে গেল দ্বিতীয় ঘরটিতে। ফিরে এসে মাথা নাড়ল, নেই।

সুটকেস, বিশ্বজিত এবং মহিলাকে নিয়ে নীচে নেমে এল ওরা।
 বিশ্বজিতকে বসিয়ে চেয়ারে বেঁধে এবার একজন অফিসারকে তুলে নিয়ে আসা হল। জাহিদ ওপর থেকে একটা টেপারেকর্তার জোয়াড় করে নিয়ে এসেছিল, সেটাকে চালু করা হল। কর্নেল এবং বিশ্বজিত পরস্পরকে দেখে অবাক। সেনাভাই বললেন, ‘ওদের দায়িত্ব সীমান্ত পাহারা দেওয়া। দেশের মধ্যে কাউকে নেআইনিভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া নয়। বিশ্বজিত সেববর্মী, আপনি শ্রীমঙ্গল বেআইনিভাবে আছেন। এখানে ক্যাম্প করে শস্ত্র লোকদের রেখেছেন। ভারত থেকে নিরীহ মানুষকে কিডন্যাপ করে এখানে এনে মুক্তিপণ চাইছেন। আর এ ব্যাপারে যে দুজন আপনাকে সাহায্য করেছে তারা এই রাষ্ট্রে আপনার বাংলাতে এসেছে। এসেের একজনের নাম, ওর নাম বলুন।’

অফিসার চোঁচিয়ে উঠলেন, ‘না না। আমি কিছু জানি না।’
 ‘তা হলে নাম বলতে আপত্তি কেন?’ সেনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন।
 ‘আমরা এই বাংলাতে এসেছি ওর সম্পর্কে অভিযোগের তদন্ত করতে।’
 ‘কী অভিযোগ?’
 ‘এটা সরকারি ব্যাপার। আমি বলতে পারব না।’
 বিশ্বজিত জ্বলন্ত চোখে তাকাল, ‘মিথ্যে বলছে।’ ওরা এসেছিল টাকা নিতে।’
 সেনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কীসের টাকা?’
 ‘এখানে থাকার জন্যে ওদের দুজনকে প্রতি মাসে টাকা দিতে হয়।’
 ‘এর নাম কী?’
 ‘হাসান আহমেদ।’

সঙ্গে সঙ্গে অফিসার আহমেদ চিৎকার করলেন, ‘আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন মিটার দেববর্মী। এরপরে এখানে থাকা আপনারাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে যাবে।’

‘আমার কাছে পুলিশ অনেক বেশি জরুরি।’ বিশ্বজিত বলল।
 ‘আপনারা পুলিশ?’ অফিসার হাঁ হয়ে গেল।
 ‘ওঁরা ঢাকা থেকে এসেছেন।’ বিশ্বজিত বলল।
 ‘ব্লিজ অফিসার, আমাকে জড়াবেন না। এসবের মধ্যে আমি কখনও ছিলাম না। ওই ইকবালটা আমাকে লোড দেবিয়ে জড়িয়ে ফেলেছে।’ লোকটি ভেঙে পড়ছিল।

‘ওর নাম ইকবাল?’
 ‘হ্যাঁ। ইকবাল হক।’

ইকবাল হককে নিয়ে আসা হল। তখন অজ্ঞাত হয়ে তিনি বোধহয় একই বেশ
আঘাত পেয়েছিলেন। এই ঘরে ঢোকার সব বুঝে গেলেন। চটজলদি কোমরে
হাত রাখতেই করিম কথা বলল, 'আপনার রিতভতার এখন আমার হাতে।'

'আমাকে মেয়ে ফেলুন। কি! না!'

'কেন?'

'আমি নিজের মুখে বলতে পারব না।'

'আপনার নাম ইকবাল হক? আপনি এবং হাসান আহমেদ জেনেশুনে টাকার
সোভে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা
করেছেন। ঠিক কি না?' সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমরা তেমন বড় অন্যায় করিনি—।' আহমেদ বললেন।

'টাকা নিয়ে আমাদের দেশের মাটিতে বিদেশি স্বত্বাসবাদীদের থাকতে
দিচ্ছেন। এটাকে আপনি বড় অপরাধ বলে মনে করেন না। চমৎকার!'
সোনাভাই চিৎকার করে উঠলেন, 'কী মনে করেন আপনারা? যারা আমাদের প্রিয়
নেতা বঙ্গবন্ধুকে খুন করেছিল তাদের সঙ্গে আপনাদের কোনও পার্থক্য আছে?
আপনারা তো রাজ্যব্যবস্থার অধম। আপনাদের মতো লোকের ওপর সীমান্ত
রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে দেশবাসী নিষ্ঠিতে আছে আর তার কী হেনস্থা করছেন
আপনারা।'

আহমেদ বললেন, 'আমি মুগ্ধিত।'

'মুগ্ধিত বললেই সাত খুন মাপ হয়ে যায় না।'

দুই অফিসারকে বন্দি করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। মহিলাকেও আবার বাঁধা
হল। সোনাভাই বললেন, 'আমার লোক আগামী চব্বিশঘণ্টা আপনার এই বাংলা
পাহারা দেবে। এই বাংলার দুটো দরজাভেই আমরা বোমা লাগিয়ে দিচ্ছি। কেউ যদি
কোনওভাবে নিজেকে মুক্ত করে দরজা খুলতে চান তা হলে নিজের নিজের মৃত্যুকে
ভেবে আনবেন। বিশ্বস্ত, চব্বিশ ঘণ্টা পরে বাংলাদেশ পুলিশ আপনাকে উদ্ধার
করবে।' অয়ারলেন্স সেটটাকে সঙ্গে নিয়ে নেওয়া হল। মোবাইল ফোনটাকেও।

বাইরে বেরিয়ে দরজাগুলো টেনে বন্ধ করা হল। বাংলার ভেতর থেকে
জাহিদ দুটো তাল্লা এনেছিল। সেদুটো সামনের পেছনের দুই দরজায় খুলিয়ে
সেওয়া হল।

অফিসারদের গাড়ির সামনে তখন দুজন যুবক পাহারায়। জাইডার ছাড়া আর
কেউ নেই। সে ভয়ে কাঁপছে। টপরেকর্ডার অন করে সোনাভাই তাকে জিজ্ঞাসা
করলেন, 'তুমি কার গাড়ি চালাও?'

'ক্যাপ্টেন হকের।'

'কী নাম তোমার?'

'ইমরান।'

'ক্যাপ্টেনসাহেবকে নিয়ে এই বাংলাতে এর আগে এসেছে?'

'হ্যাঁ। প্রত্যেক বাসে সাহেবরা একবার করে আসেন।'

'কেন আসেন?'

'জানি না।'

'এখানে এলে সাহেব কি তোমাকে কোনও বকশিশ দেন?'

'হ্যাঁ। পাঁচশো টাকা বকশিশ দেন।'

'ঠিক আছে, গাড়ি নিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে চলে।'

কাউকে পাহারায় না রেখে সোনাভাই সবাইতে নিয়ে সেই নির্জন বাংলোয়
যখন ফিরে এলেন তখন রাত তিনটে। সব কথা শোনার পর বাসুদেব জিজ্ঞাসা
করল, 'আপনার কি মনে হয় ওরা সৌমিত্রকে ছেড়ে দেবে?'

'আমার মনে হয়ে নেবে।'

'যদি না হয়ে?'

'এখন থেকে আগরতলায় পৌঁছোতে দশ ঘটীর বেশি লাগার কথা নয়।
ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্বস্তিত পালাতে পারবে না।'

'কিন্তু আপনি তো ওই বাংলাতে কোনও গার্ড রাখেননি—।'

'রাখিনি। কারণ পুলিশের নজরে আমার কোনও ছেলে পড়ক আমি চাই না। এত
রায়ে ওদের উদ্ধার করতে নিশ্চয়ই কেউ আসবে না। কারণ কেউ সন্দেহ করেনি যে
বিশ্বস্তিত বন্দি হয়ে আছে। তার আগেই সৌমিত্র ডাক্তারের সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া
উচিত।' সোনাভাই বললেন, 'কিন্তু বাসুদেব, এবার যে ঘটনা ঘটবে তাতে তোমারও
এখানে থাকা উচিত নয়। ওই ক্যান্টেনের গাড়িতে তুমি ওঠো। করিমও সঙ্গে থাক।
ভাতিদ তুমিও ওদের সঙ্গে থাকো। ওই গাড়িতে তুমি বন্ধুনে বর্জর চলে যেতে
পারবে। তোমার উচিত আজই এ দেশ থেকে চলে যাওয়া।'

'কিন্তু—।'

'না। কোনও কিন্তু নয়। এর পরেও যদি ডাক্তার মুক্তি না পায় তা হলে কিছু
করার নেই।'

বাসুদেব সোনাভাইয়ের হাত ধরল, 'আপনি যা করলেন তার জন্যে—।'

'চুপ করো। একবার সালে তোমার বাবা যা করেছেন এ তার তুলনায় কিছু
নয়। যাও। আর এবার বৈধ ভিসা নিয়ে ঢাকায় এসো।' সোনাভাই হাসলেন।

বাসুদেবকে নিয়ে করিমও জাহিদ ক্যান্টেনের গাড়িতে বসে যাওয়া
পর সোনাভাই মোবাইলের বোতাম টিপলেন। রিং হচ্ছে। এবার গলা পেয়ে তিনি
বললেন, 'বাবলভাই, হোম মিনিস্টারকে এখনই ফোনে ধরুন। বলুন শ্রীমঙ্গল থানার
অফিসারকে আমার কথা বলতে। বিরাট ঝামেলা হয়েছে।'

'ঝামেলা? মানে, কাজটা হয়নি? বাবলভাই উদ্বেগ।'

'হয়েছে। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিক্রি করতে চায়
এমন দুজন অফিসারকে ধরতে হয়েছে। আপনি ফোন করুন।'

'মিনিস্টারকে এত রাতে ফোন করা ঠিক হবে? আমি হোম সেক্রেটারি আর
পুলিশের প্রধানকে ফোন করছি। ওই দুজনকেই আমি ডাল চিনি।' বাবলভাই
বললেন।

'ঠিক আছে, যা করার তাড়াতাড়ি করুন।' ফোন বন্ধ করলেন সোনাভাই।

ভোরের একটু আগে একটা গাড়ি শ্রীমঙ্গল থানায় ঢুকল। থানায় তখন আলো

জ্বলছে। গাড়ির আওতাজ পেয়ে খোদ দারোগা এসে দাঁড়ালেন গেটে। গাড়ি থেকে নামলেন সেনাভাই। এগিয়ে গিয়ে প্রাথমিক সজ্জাখণের পর বললেন, 'আমার নাম আকবর হাফিজ সেনা।'

'আসেন আসেন। আপনার আসার কথা শুনেই অপেক্ষা করছি, কী ব্যাপার?'

'আপনার ঘরে চলুন।'

দারোগার ঘরে গিয়ে বসার পর সেনাভাই ওঁকে টেপ বাড়িয়ে শোনালেন। শোনার পর ডব্রলোকের চোখ কপালে উঠল, 'আই বাপ। সর্বনাশ। হাল্যার কুখ্যার?'

'আমার গাড়িতে আছেন দুজন।'

'দুজনেই?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এই টেপটাই ওদের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ। এটা আমি সোজা হোম মিনিস্টারের হাতে দিতে চাই।' সেনাভাই বললেন।

'আমাকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।'

'জানি। তবু, সাবধানের মার নেই।'

'কিন্তু আপনি ঢাকায় বসে যে কথা জানলেন আমি এই শ্রীমঙ্গলে থেকেও টের পাইনি? আপনি কি আমার ডিপার্টমেন্টের মানুষ?'

'না। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের উপকার হয় এমন কাজ করতে পারলে আমি শান্তি পাই। আপনি এদের আরেস্ট করুন।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু ঢাকায় আপনাকে কে খবরটা দিল?'

'একজন সাংবাদিক।'

'কিন্তু এখানে এসে আমাকে আগে জানানেন না কেন?'

'সময় পাইনি।'

'সেখন তো কত বড় বিপদ হতে পারত আপনার?'

'তা ঠিক।'

'দারোগা নিজে গেলেন অফিসারদের নিয়ে আসতে। তাদের চেয়ারে বসিয়ে যাবতীয় অভিযোগগুলো লিপিবদ্ধ করতে করতে ভোর হয়ে গেল। টেপ রেকর্ডারের স্বীকারোক্তির কথাও লেখা হল। এবার দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, "বাংলাটা কোথায়?'

সেনাভাই বুঝিয়ে দিলেন, 'কিন্তু একটা অনুরোধ।'

'বলুন।'

'আরও তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। তার আগে ওখানে যাবেন না।'

দারোগা অবাক, 'কেন? যদি পাখি উড়ে যায়?'

'যাবে না। সেই গ্যারান্টি আপনাকে দিচ্ছি।'

'আমি আপনার কোনও কথা বুঝতে পারছি না। যাক গে, ঢাকা থেকে ফোন এসেছে যখন তখন আপনার কথা শুনিছি। এবার বি ডি আরকে জানাতে হবে। ওরা নিজেদের আইনে বিচার করতে চাইলে আসামিদের ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। মুশকিল হল, ওরা প্রমাণ চাইবে। তখন কী করব? দারোগা সত্যি সমস্যা

পড়লেন।

ঘণ্টাখানেক সময় চেয়ে সেনাভাই কুদ্দুসসাহেবের বাংলাতে চলে এলেন। সেসময় তিনি সঙ্গে যুম থেকে উঠেছেন। সেনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কাছে দুটো টেপেরেকর্ডার আর একটা খালি ক্যাসেট আছে?'

'দুটো তো নেই। একটা টেপডেক আর ক্যাসেট আছে।' কুদ্দুসসাহেব বললেন।

'মুশকিল হয়ে গেল। টেপের জন্যে তো আর বিশ্বজিৎদের বাংলায় যাওয়া যায় না।'

কুদ্দুসসাহেবের চোঁয়ার আর একটা টেপেরেকর্ডার যোগাড় হল। ক্যাসেটটা ট্রান্সকার করতে দিয়ে সেনাভাই চা খেতে খেতে কুদ্দুসসাহেবকে সব কথা খুলে বললেন। শুনে কুদ্দুসসাহেবের চোখ কপালে উঠল, 'সর্বনাশ। এরা তো দেশদ্রোহী।'

'আমি ঢাকার ফিরে প্রথমে সাংবাদিক সম্মেলন করতে চাই মুক্তিযোদ্ধা কমিটির পক্ষে। সব কাগজে খবরটা বের হোক যাতে ভবিষ্যতে বিদেশি উগ্রগহীরা এ দেশে জায়গা না পায়। আপনি একটা উপকার করুন। এই ক্যাসেটটা ধারার দারোগার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমি ঢাকায় রওনা হচ্ছি।' সেনাভাই বললেন।

কুদ্দুসসাহেব বললেন, 'আপনি মনে হয় কোনও কিছুর ভয় পাচ্ছেন?'

'আমি ক্যাসেটটা বড়িয়ে রাখতে চাই।'

'তা হলে স্লেম চলে যান।'

'না। এই ছেলেদের রেখে আমি যেতে পারব না।'

'তা হলে এক কাজ করুন। আপনার, না আপনার নয়, বাবলভাইয়ের ঠিকানায় কুরিয়ার করে দিন ক্যাসেটটা। আপনি পৌঁছোবার আগেই ভটা নিরাপদে পৌঁছে যাবে।'

কুদ্দুসসাহেবের পরামর্শ ভাল লাগল সেনাভাইয়ের। ট্রান্সকার হয়ে গেলে একটা বাড়িয়ে শোনা হল। দেখা গেল গলার স্বর ঠিক আছে। ক্যাসেট ধান্য পাঠাবার ব্যবস্থা করে কুদ্দুসসাহেব সেনাভাইকে নিয়ে শহরে গেলেন। তখনও অফিস খোলেনি, খোলার সময় হয়নি। কিন্তু কুদ্দুসসাহেব কুরিয়ার সার্টিসের মালিককে খুঁজে বের করলেন। কুদ্দুসসাহেবের চা বাগান এদের বড় গ্রাহক। সেই তিনিই নিজেকে এসেছেন দেখে মালিক বেশ বিগলিত। তিনি বললেন, 'যেমন করই হোক আজ সকালের ঝাইটে ঢাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি স্যার। পেমেণ্টের ব্যাপারে ভাববেন না। আপনি এসেছেন এটাই আমি ভাবতে পারছি না।'

ওদের সামনে মোটা খামে ক্যাসেট ভরে সিল করে নিয়ে মালিক ছুটিল। সেনাভাই আবার ঢাকায় ফোন করলেন। বাবলভাই তাঁর গলা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাসুদেব কোথায়?'

'সে বোধহয় এককণে সীমান্ত পরিয়ে যাচ্ছে। ওর জন্যে চিন্তা করবেন না। বি ডি আরের গাড়িতে গিয়েছে। মন দিয়ে শুনুন। আজই আপনি একটা প্যাকেট কুরিয়ার সার্টিসে পাবেন। ওটা পাওয়ার পর আগামীকাল মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ

থেকে একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবেন। আর হ্যাঁ, প্যাকেটটা খুলবেন না।'
'কী আছে প্যাকেটে?'
'রাজ্যসভার সীকারোক্তি।' সোনাভাই বললেন।

দাবাটা খুব জমে উঠেছিল। পার্বত্য ত্রিপুরার যে লোকটির সঙ্গে সৌমিত্র দাবা খেলছে গত কয়েকদিন ধরে তার খেলার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম দিকে খেলতে বসেই সে বিপক্ষের বল খেয়ে নিত নিজের বলের বিনিময়ে। ক্রমশ একটু একটু করে সে সৌমিত্রকে অনুকরণ করে চাল ভাবতে শিখল। সৌমিত্র রাজ্যকে দুর্গজাত করার লোকটা আক্রমণ করতে পারছে না। গালে হাত দিয়ে সে শুধু ভেবেই চলেছে। এমন সময়ে ছেলেটি এল। এই বিপ্লবী ছেলেটির নাম সৌমিত্র এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি।

ছেলেটি এসে বলল, 'ভোর হতে না-হতেই দাবা খেলছেন? এখনও তো মোরগ ডাকছে জঙ্গলে।'

'কী করব? ও ইশারা করল, আমারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সূর্য না উঠলেও দাবা খেলার মতো যাচ্ছে আলা ফুটছে। এখানে তো সময়ের হিসেব করে কোনও লাভ নেই।' সৌমিত্র বলল।

'উঠে পড়ুন। চটপট। শার্ট প্যাট পরে নিন।'

'কেন? আবার হটিতে হবে?' সৌমিত্র শ্রদ্ধিত।

'হ্যাঁ। দেখুন, জুতোটা পায়ে ঢোকালে বাথা বাড়ে কি না, নইলে ওটা হাতেই নিন।'

মিনিট দুয়েকের মধ্যে ওরা হাঁটা শুরু করল। সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আপনি আগরতলায় ফিরে যাবেন।' ছেলেটি বলল।

'কী? চমকে উঠল সৌমিত্র।

'দাঁড়াবেন না। বর্ডার পার হতে হবে আটটার মধ্যে। নইলে আজ আর ওপারে যেতে পারবেন না।'

'তার মানে তেমনরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' ছেলেটি আবার হটিতে লাগল।

জুতোভোড়া পায়ে ঢোকাতে বেশ ব্যথা লাগছিল। ক্ষত একটু শুকিয়েছে, ব্যথা খুব। বরং খালি পায়ে হটিতে বেশি আরাম লাগছে। জুতোভোড়া হাতে ফুলিয়ে নিয়েছিল সৌমিত্র। এখন তার মন বিচ্যেদ ভরে গেল। তা হলে পঁচিশ লক্ষ টাকা এসের দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। বাবার চাকরিসূত্রে পাওয়া টাকা আর গরনা বিক্রি করে বড়জোর পনেরো লক্ষের ব্যবস্থা হতে পারে, বাকিটা কি তা হলে ধার করা হল? খুব খারাপ লাগছিল। এই ধার তাকেই শোধ করতে হবে। আগরতলায় এখন বেশ করেকজন ডাক্তার আছেন যাদের দৈনিক রোজগার পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু তারা সার্জন। অপারেশন করে থাকেন। একজন সাধারণ এম বি বি এস-
১২৪

এর পক্ষে এখনই দিনে দুশো টাকা রোজগার করা প্রায় অসম্ভব। সে-কারণেই তাকে চাকরি নিতে হয়েছিল।

আপশোস হুস্থিল আর একটা কারণে। টালফার অর্ডার আসার পর সবাই তাকে নিবেদন করেছিল মান্দার অঙ্কলে যেতে। সেই নিবেদনটা শুনে আজ তার পরিবার এমন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ত না। হঠাৎ তার মনে পড়ল এরা বাসুদেবের খোঁজ করছিল। বাসুদেব নাকি উগাও। সেইসঙ্গে দশরথ দেববর্মী নামের একটা লোক। বাসুদেবকে কি অন্য কোনও উগাপন্থী দল অপহরণ করেছে? কিন্তু এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার মূল বাসিন্দাদের তো অপহরণ করা হয়নি। তা হলে একই সঙ্গে দশরথকেও পাওয়া যাচ্ছে না কেন? জেস্টারের কথার মনে হয়েছিল, দশরথের জন্য সে খুব উদ্বিগ্ন।

হঠাৎ সৌমিত্র প্রশ্ন করল, 'দশরথ দেববর্মী কে?'

'আমি চিনি না।' ছেলেটি হটিতে হটিতে জবাব দিল।

আশ্চর্য ছেলে। কিছুতেই খোঁসল ভেঙে সহজ হবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেসব বিপ্লবী ইংরেজদের হত্যা করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তাদের ভাবভঙ্গির সঙ্গে এই ছেলের বেশ মিল আছে।

হটিতে হটিতে ওরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছে ক্যাম্প থেকে। এখন রোদ উঠেছে। আগরতলায় যেতে হলে আটটার মধ্যে সীমাটা পেরোতে হবে। এই ছেলেটি কত দূরে তার সঙ্গে যাবে বোঝা যাচ্ছে না। ও যদি এখানেই দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে, এবার থেকে নিজেই পথ চিনে হাটুন তা হলে সে কিছুতেই পৌছোতে পারবে না। কারণ এটটা পথ তারা এসেছে কিন্তু কোনও বাড়ি দেখতে পারনি।

'এবার পায়ে বাথা হচ্ছে।' সৌমিত্র অনাল।

'আপনি কি একটা দিন এখানে থাকতে চান?' ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

'তা হলে হাটুন।'

'এভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে কেন? কাছাকাছি কোথাও গাড়ি চলাচলের রাস্তা নেই?'

'না। আছে। কিন্তু সেখানে আপনাকে দেখতে গেলে ওরা বাংলাদেশের জেলে ভরে দেবে।'

'ও। আমরা কোনও গাড়ি ভাড়া করতে পারি না?'

'না। আর পঁচিশ মিনিট, এখন আর কথা বলবেন না।' ছেলেটি সতর্ক করল।

মিনিট পনেরো বাড়ে ছেলেটি দাঁড়াল। একটা বড় গাছের আড়াল থেকে চারপাশে দেখল। ওকে দেখানো নিজেই লুকিয়ে রাখল সৌমিত্র।

দুজন উদ্ভিপরী সৈনিক হাতে অস্ত্র নিয়ে কিছুটা দূর দিয়ে হটে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেল। ওরা চারপাশে তাকাল, নিশ্চিত হয়ে আবার হটিতে শুরু করল। ছেলেটি ইশারা করল এগিয়ে যাওয়ায় অন্যে। খুব ক্ষত ছেলেটি হটিছিল। ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না সৌমিত্র। কিন্তু সে বুকতে পারল সীমানা পেরিয়ে

এসেছে। এখানে সৈনিকদের সেখতে পেল না সে। এবার সহজ ভঙ্গিতে আবার জঙ্গলের ঢুকে গেল হেলগেট। সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'এদিকে পাহারা নেই?'
'আছে। এক ঘণ্টা পর পর ওরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে উঠল দিয়ে আবার কিরে যায়। এই অঞ্চল দিয়ে আজকাল সাধারণ মানুষ যে পরাণপার করে না তা ওরা জানে।' হেলগেট বলল।

'কেন করে না?'

'প্রথম কথা, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অনেকটা হেঁটে আসতে হয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের এড়িয়ে যেতে চায়।'

'তোমরা কোথায়? এতটা পথ এলাম, আর কাউকে তো দেখতে পেলাম না।'
'আছে। তারা কেন আপনাকে দেখা দেবে। এই যে আমি আপনাকে নিয়ে সীমানা পেরিয়ে এলাম এই স্বর মেইন ক্যাম্পে একই পরেই পৌঁছে যাবে।'
'মেইন ক্যাম্প কোথায়?'

'জানি না।' হেলগেট মুখ বন্ধ করল।

'তোমাদের সর্বাধিনায়কের নাম কী?' সৌমিত্র নাড়াঘাটান।

'আমি যে কোনও জবাব দেব না তা আপনি জানেন।'

'বুঝলাম। অম্বা ভাই, তুমি সত্যি বিশ্বাস কর ত্রিপুরা কখনও স্বাধীন হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু ত্রিপুরা তো পরাধীন নয়। সে ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ, স্বাধীন।'

'এসব বুজোঁয়াদের কথা। সাড়ানো কথা। ঊনপঞ্চাশ সালের পনরোই অক্টোবরের আগে ত্রিপুরা কি ভারতের অঙ্গ ছিল? ভারত আলাদা ছিল ত্রিপুরা আলাদা। তা হলে? ওই আসামের মধ্যে দিয়ে না আসলে আপনারা ভারত থেকে এখানে পৌঁছোতে পারবেন? ভারতের অন্য কোনও রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান কি এরকম? আসলে, আপনারা, বিদেশিরা ত্রিপুরার বুকের ওপর জাকিয়ে বসেছেন, দু হাতে টাকা কামাচ্ছেন অতএব ত্রিপুরাকে ভারতের অঙ্গ না বললে তো আপনাদের অসুবিধে হবে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনি ভারত সরকারের চাপে ত্রিপুরাকে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা পরাধীন, ভারতের কাছে।' হেলগেট কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। বলার সময় তাকে খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছিল।

'কিন্তু তোমার স্বপ্ন যদি সত্যি না হয়?'

'স্বপ্ন সত্যি হবেই। আমি যদি দেখে না যেতে পারি, আমাদের পরে যারা আসবে তারা স্বপ্নটাকে সত্যি করবে।' হেলগেট জোরের সঙ্গে বলল।

'তোমাকে একটা কথা বলছি।'

'কলুন।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। কিন্তু তোমার মধ্যে যে জোর আছে তাকে আমি শ্রদ্ধা করছি। এবং সেইসঙ্গে আপশোস হচ্ছে এই কারণে তুমি যদি মূলত্বোত্তর সঙ্গে যুক্ত হতে তা হলে দেশ হফতো আকৃতিকৃত নেতাকে পেত।' সৌমিত্র বলল।

১২৬

'হেলগেট শব্দ করে হাসল, 'আপনাকে আমি বেশ বুদ্ধিমান বলে ভাবছিলাম।'
'ভাবনা পালটাতে হচ্ছে কেন?'

'কী ধরনের নেতা হতে পারি যদি ভারতবর্ষের মূলত্বোত্তে থাকি? চোর বদমাশ ডাকাতি কালোবাজারির নেতা? ব্যক্তিগতভাবে জানো যারা দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়? বোফর্স বা তহেলকা উটকমের কথা হেঁচে দিন, আপনাদের দেশে এই মুহুর্তে কোনও নেতা আছেন যাকে সারা দেশের মানুষ এক বাক্যে শ্রদ্ধা করে? না নেই। প্রায় প্রতিটি নেতা তার দুর্গন্ধ চেপে ফরসা পাঞ্জাবি পরে গলা ফুলিয়ে বক্তৃতা দেন। নিজে চুরি না করুন, হেলেমেয়ে জামাইকে চুরি করার সুযোগ দেন না তারা? নির্বাচনে জেতেন কী করে? টাকা আর গুলি দিয়ে ভোট পেতে হয় কেন তাঁদের? কারণ মস্তিষ্ক পেলে তার বহুগুণ নিজের গকেটে ঢোকাতে পারেন। আমি আশ্চর্য্য করব কিন্তু এইরকম একজন নেতা হতে পারব না।' হেলগেট বেশ উত্তেজিত গলায় বলে গেল।

সৌমিত্র কোনও কথা বলল না। এই ছেলের মাথা থেকে হাজার চেষ্টা করলেও এইসব ডাবনা দূর করা যাবে না। হঠাৎ হেলগেট দাঁড়াল, 'আপনি বাসে যেতে চাইছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এগিয়ে যান। বাঁ দিকে পাঁচ মিনিট গেলে রাস্তা পেয়ে যাবেন।'

'তুমি যাবে না?'

'না। আমি ওদিকে যাব না।'

'কেন?'

'ওদিকের গ্রামটাতে বাঙালিরা থাকে।'

'তো?'

'আমরা কেউ কারও এলাকায় যাই না।'

'কিন্তু আমি একা যাব না। প্রথম কথা, আমার গকেটে একটা টাকাও নেই। দ্বিতীয় কথা, যদি আমি আবার কোনও দলের হাতে পড়ি তা হলে—।' থেমে গেল সৌমিত্র।

'আপনি এমনভাবে বলছেন যেন এরকম ঘটনা শুধু ত্রিপুরাতেই ঘটছে।'

'আমি সে কথা কখন বললাম? এ কথা সবাই জানে কোনও কোনও চক্র আছে যারা তোমাদের নকল কোরে এই কাজ করে।' সৌমিত্র বলল।

'হ্যাঁ। জানতে পারলে আমরা তাদের শাস্তি দিই। কিন্তু আমরা কাজটা করি টাকার জন্যে। কারণ স্বাধীনতায়ুদ্ধে টাকার দরকার হবে। কিন্তু ব্যক্তি যারা শুধু ব্যক্তিগত রাজস্বার্থের জন্যে মুক্তিপণ দাবি করে তাদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে আমাদের ফেলবেন না।' হেলগেট বলল, 'তা হলে চলুন হাটা যাক।'

দুপুর নাগাদ তারা সেই বাড়িতে পৌঁছোল যেখানে মহিলা খাবার এনে তাদের দিয়েছিলেন। সেই বাড়ি একইভাবে রয়েছে শুধু কোথাও কোনও পাহারাদার নেই। সৌমিত্রকে বাইরের বারান্দায় বসিয়ে রেখে হেলগেট ভেতরে ঢুকে গেল।

সৌমিত্র দেখল পায়ের শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতগুলো আবার ঢালা হয়েছে। এভাবে

১২৭

না হেঁটে যদি সে কাছাকাছি কেনও পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে সব কথা বলে তা হলে নিশ্চয়ই একটা গাড়ির ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু তাতেও তো একটা সমস্যা হবে। বাড়ি থেকে পুলিশকে জানানো হয়েছে কি না সে জানে না। ফলে উল্টো বিপত্তি না হয়। আগরতলায় পৌঁছোলে এ নিয়ে হইচই হবেই। ডি আই জি সাহেব নিজের ছেলেকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনলেন, লোক সব জেনে শুনেও ছিঁ করবে। এইসময় হোস্টেট বেরিয়ে এল, 'খাবার আসছে। আর আপনি জেনে খুশি হবেন একটি অটোরিক্সা কাছেই আছে। আপনি ওটার চড়ে আগরতলায় যেতে পারবেন।'

অন্ধকারে গাড়িটা চুটে যাচ্ছিল। হঠাৎ আলোর ইশারায় থামতে বলার জাইভার গাড়ি থামাল। উর্দিপরা জাইভার কর্নেলের গাড়ি চালাচ্ছে দেখে গাহারামার কথা বরত করল না। গাড়ি এগোল। এরপর করিম জাইভারকে বলেছিল, 'তুমি বুঝতেই পারছ আমার শুভা বদমাশ নই।'

'না স্যার।' জাইভার মাথা নেড়েছিল।

'কী করে বুঝলে তুমি?'

'তা হলে দারোগাসাহেব আপনাদের অত খাতির করত না। আমাদের দুই সাহেবকে আরেস্ট করত না।' বলেই একটু চুপ করে গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সাহেবরা নিশ্চয়ই খুব বড় অন্যায্য করেছে, না স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের ওখানে অনেকেই সাহেবদের ওপর রেগে আছে। আর চাকরি থাকবে না, না?'

'না। ফাঁসি হয়ে যাওয়া উচিত।' জাহিদ বলেছিল।

শেষপর্বে রাস্তা যেখানে শেষ হল সেখানেই বি ডি আরের অফিস। দ্রুত দুজন অস্ত্রধারী এগিয়ে এল। কর্নেলের গাড়ি দেখে স্যালুট করল।

করিম বলল, 'এই ভদ্রলোক একজন রিপোর্টার। ওকে ওপারে যেতে দিন।'

'কিছু—!'

'না দিলে বিপদ হবে। আমরা মুক্তিযোদ্ধা।' জাহিদ গভীর গলায় বলল।

একজন সৈনিক বলল, স্যার আমরা যেতে দিলেও বি এস এফ ছাড়বে না।'

'সেটা ঐর সমস্যা। আপনি যান।' বেশ কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলল জাহিদ।

ওদের ধন্যবাদ দেওয়ার সুযোগ পেল না বাসুদেব। গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কোনদিকে যাব? রাস্তা তো—!'

জাইভার বলল, 'বা দিকের সঙ্গ রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে যান স্যার।'

বাসুদেব চোখের আড়াল হতেই গাড়ি ছোরাতে বলল করিম। জাইভার তৎপরতার সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হতেই জাহিদ ইশারা করল করিমকে। নিচু গলায় বলল, 'এখানে নেমে গেলে প্রচুর হটতে হবে। ঠিক সময়ে নেমে যাব।'

তখন ভোর। আকাশে রং সেগেছে, পাখি ডাকছে। বাসুদেব এগোচ্ছিল। হঠাৎ চিংকার ভেসে এল, 'হুট!'

সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর হাত তুলল।

চিংকারটা এবার কাছে এগিয়ে এল, 'হু কামস দেয়ার?'

বাসুদেব জবাব দিল চৈতন্যে, 'ফ্রেড!'

চারজন ভারতীয় বি এস এফ সৈনিক এগিয়ে এল। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

'রিপোর্টার।'

'ইন্ডিয়ান না বাংলাদেশি?'

'ইন্ডিয়ান।'

'পাসপোর্ট?'

'কম্যান্ডান্ট কোথায়? তাঁর কাছে নিয়ে চলো।' বাসুদেব এদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল না। ওরা ওকে নিয়ে ক্যাম্পে এল। একটা চেয়ার দিল বসতে। বলল ওকে অপেক্ষা করতে হবে। আধঘন্টা পরে যখন পৃথিবী পরিষ্কার তখন কম্যান্ডান্ট এসেন। দূর থেকেই তিনি চিংকার করলেন, 'আরে তুম? বাসু, হোয়াট এ সারপ্রাইজ!'

বাসুদেব উঠে দাঁড়াল। বিনোদ কাপুর। ছুলে ওরা একসঙ্গে পড়ত। ট্রেনারকে মারার অপরাধে যখন তাকে ছুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল তখন বিনোদ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। সে উদ্বেগিত হল, 'আরে ইয়ার। তুমি এখানে?'

বিনোদ কাপুর বিষাসই করতে পারছিল না নিজের চোখকে। বাসুদেব হেসে বলল, 'পৃথিবীটা সত্যি ছোট।'

'তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি কোথেকে আসছ?'

'আপাতত বাংলাদেশ থেকে।'

'কী ব্যাপার? গভীর হয়ে গেল কাপুর।

'তুমি কি জান আমি এখন কোন প্রকোশে আছি? বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'একটুআধটু শুনেছি। তুমি টিভি রেডিয়ার মিডিয়ায় কাজ করছ। লাল কিছুদিন আগে বলছিল।'

'হাল এখন কোথায়?'

'এতদিন এখানেই ছিল, এখন নর্থ বেঙ্গলে পোস্টেড।'

'আমি একটা অপারেশনে গিয়েছিলাম।'

'তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। ইউ বেটার কাম উইম মি।'

'বিনোদ কাপুরের সঙ্গে গেল বাসুদেব। এখানে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের জন্যে অস্থায়ী ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে। তার একটাকে বিনোদ থাকে। বিনোদ বলল, 'তুমি খুন্টন করে আসনি তো?'

'না। তোমার ভক্ত নই।'

'তোমাকে বাংলাদেশে অপরাধী হিসেবে বুঁজছে না তো?'

'বরং উল্টো। আমার জানে বাংলাদেশ সরকার জানতে পারবেন তাঁর মতো কোন কোন অপরাধী ভাল মানুষের সুযোগ পাবে আছে। বাসুদেব বলল।

'তার মানে তোমার মাথা বয়স বাড়ার সঙ্গে একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।' হাসল

কাপুর।

‘বুঝলাম না।’

‘মনে নেই? ইনস্ট্রাক্টরকে তুমি কীরকম মেরেছিলে?’ বলেই যেসে উঠল কাপুর।

মাথা নাড়ল বাসুদেব। সেই ঘটনা না ঘটলে আজ হয়তো সে বিনোদের মতো একজন বড় অফিসার হয়ে থাকত। তাতে অবশ্য আপশোস নেই। সে এখন যা করছে তাতেও তো বেশ মজা পাচ্ছে।

বিনোদ তাকে জান করে নিতে বলল। সেসব করার পর বাসুদেব হালকা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমি আগরতলায় একটা ফোন করতে চাই।’

‘নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যাপারটা আমি জানতে চাই বাসুদেব।’

অতএব বলতে হল। ঘটনা সত্ত্ব সংক্ষেপে বলতে বলতে খেঁচল বিনোদ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ওর চোখ মুখ তাই বলছে। শেষ করার পর জিজ্ঞাসা করল, ‘এই দুই অফিসারের নাম বলতে পার?’

‘একবার শুনেছিলাম, এখন মনে নেই। ওরা এখন থানায় আছে।’

‘শুভ। কিন্তু তোমার রিলেটিভকে কি ওরা ছেড়ে দিয়েছে?’

‘সেওয়ার কথা। তা হলে একতলা ও নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ান পৌঁছে গেছে।’

‘তুমি বাড়িতে ফোন করে জানতে চাও খবরটা?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমার এখন থেকে সরাসরি কথা বলা যাবে না। তুমি নাথার দাও।’

বিনোদ অপারেটরের মাধ্যমে যোগাযোগ করল। মিনিট তিনেক চেষ্টার পর আগরতলার বাড়ির লাইন পাওয়া গেল। বিনোদ বলল, ‘স্পিক হিয়ার।’

রিসিভার নিয়ে বাসুদেব বলল, ‘বাসুদেব বলছি।’

‘পি. বি-এর উত্তেজিত গলা শোনা গেল, ‘তুমি? তুমি কোথায়?’

‘আমি নিরাপদে আছি। বিকেলের মধ্যে বাড়িতে পৌঁছেছি। সৌমিত্রর কোনও খবর পেয়েছেন আপনারা?’ বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

‘নো। নো।’

‘ওকেন। আজই পাবেন। দয়া করে টাকা দেবেন না।’ বলে লাইন কেটে দিল সে।

বিনোদ জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি এত নিশ্চিত হলে কী করে?’

বাসুদেব তাকাল, ‘কোনও দলের ডিক যদি ছকুম করে তবে সেট নীতের তলার লোক মানবে না?’

‘ইউ ভোল্ট নো।’ মাথা নাড়ল বিনোদ, ‘এরজন্যে তোমাকে আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। যাক গে, তুমি আমাকে সমস্যা ফেললে।’

‘কীরকম?’

‘আমি জানতাম চোরামোহা সীমান্ত পেরিয়ে কেউ কেউ যাওয়া আসা করে। দুপাশের গ্রামের লোকেরা এরকম করলে আমরা খুব কঠোর হই না। আমরা নজর রাবি ম্যাগলারদের ওপরে। চোখ এড়িয়ে যে কেউ যাওয়া আসা করে না তা

অস্বীকার করব না। কোনও নদী বা পাহাড় দুই দেশের মধ্যে সীমানা হিসেবে থাকলে যে সুবিধে শুধু মাঠ জঙ্গল সেটা পাওয়া যায় না। আমাদের দুই দেশের মাঝখানে তো আর লোহার ফেনি তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু এদেশের স্বাস্থ্যবাদীরা যদি সহজেই ও দেশে যাওয়া আসা করে তা হলে দুকুতে হবে ওরা আমাদের কারও সাহায্য পাচ্ছে। ওরা যাচ্ছে আর আমরা চোখ বুজে আছি এটা হতে পারে না। যারা চোখ বুজে থাকছে তাদের নিশ্চয়ই লাভ হচ্ছে। এই লোকগুলো দেশের শত্রু। তুমি কোন জায়গা দিয়ে ওপারে গিয়েছিলে?’

‘জায়গাটা আমি মনে করতে পারছি না। কারখানা আমি অনেকটা পথ জঙ্গল দিয়ে হেঁটে ওপারে গিয়েছি। ইনফ্যান্ট্রি, এই অঞ্চলের কিছুই আমি চিনি না।’ বাসুদেব বলল।

‘তুমি কীভাবে গেলে? কেউ নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করেছিল।’

‘হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করো না। এই অঞ্চলে যারা এমন ব্যবসা করে তাদের নাম যি তোমরা না জান তা হলে সেটা কৃতিত্বের নয় বিনোদ।’ বাসুদেব বলল।

‘বুঝলাম। আমি ব্যাপারটা দেখছি। হ্যাঁ, তৃতীয় যে সমস্যা তার কী সমাধান করবে?’

‘কোন সমস্যা?’

‘যে লোকটাকে তুমি তোমার বামারবাড়িতে বন্দি করে রেখেছ তার কী করবে?’

‘ওকে ছেড়ে দেব যদি সৌমিত্র কিয়ে আসে।’

‘যদি না কিয়ে আসে তা হলে তুমি কতদিন ধরে রাখবে?’

‘এখনও ভাবিনি।’

‘ছেড়ে দিলেই সে তোমার প্রধান শত্রু হয়ে যাবে।’

‘আমি জানি। কিন্তু কোনও উপায় ছিল না।’

‘আমি এ ব্যাপারে তোমাকে পরামর্শ দিতে পারি।’

‘যেমন?’

তোমরা পুলিশে ডায়েরি করো। এবং এই ব্যাপারে ওই লোকটাকে দাবী কর। এতে পুলিশ ওকে আরেস্ট করার সুবিধে পাবে। তোমার আত্মীয় এসে যদি বলে ওর ছেলের দল তাকে কিডন্যাপ করেছিল তা হলে মনে হয় কোর্ট ওর বেইল দেবে না। ও কি জানে কোথায় আছে?’

‘না। সে সুযোগ ছিল না। জিপের নীচে উপুড় হয়ে শুয়েছিল দশগুণ যখন ওকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার জাইভার ওকে কোনও খবর দেবে না।’

‘যদি সেখ তোমার রিলেটিভ ফেরেন তা হলে ওকে কোর্টে তুলে কোনও লাভ হবে না, বেইল পেয়ে যাবে। কিন্তুই গ্রহণ করতে পারবে না তোমরা। সে ক্ষেত্রে ওর চোখ বন্ধ করে বহু দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে এসো যাতে সে জায়গাটাকে আইডেন্টিফাই না করতে পারে।’ বিনোদ বলল।

‘বুঝতে পেরেছি।’

চা খাবার খাইয়ে নিনাদ তার দপ্তরের একটা জিপে বাসুদেবকে তুলে দিল যেটা আগরতলায় থাকছিল। বাসুদেবের এখন খুব ঘুম পাচ্ছিল। এই জিপে থাকলে উদ্রপহীরা কিছু করবে না। বি এস এফের জিপ ওরা এড়িয়ে যায়। অতএব নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায়। রাত্তা যতই খারাপ হোক ঘুম আসতে পেরি হল না।

আগরতলা চারশো টাকা। হেলোটি অটোচালককে বলেছিল, 'কোথাও না থেমে চলে যাবি।'

লোকটি মাথা নেড়েছিল, 'ইঞ্জিন গরম হয়ে যাবে। তেলও নিতে হবে যে।'

'যা করার করিস কিছু এর খেন কোনও ক্ষতি না হয়।'

'তা হলে রাতে গাড়ি চালাব না।'

'কেন?'

'কখন কোথা থেকে কোন শালা এসে মাল চাইবে কে জানে।'

'যা ভাল হয় তাই করবি।'

'টাকাটা—'

সৌমিত্র শুনছিল। বলল, 'বাড়ি গিয়ে আমি টাকা দেব, চিন্তা করো না।'

'আমি তো শহরের ভেতর ঢুকব না।'

'কেন?'

'নিষেধ আছে।'

সৌমিত্র হেলোটির দিকে তাকাল। হেলোটি বলল, 'ফিরে এসে টাকা নিবি।'

'পেটলের দামটা—' অটোচালক ইতস্তত করল।

হেলোটি ওদের দাঁড়াতে বলে কোথাও গেল। ফিরে এল দশ মিনিটের মধ্যে।
এতক্ষণ অটোতে চুপচাপ বসেছিল সৌমিত্র। একটা পুলিশের গাড়ি পাশ দিয়ে
বেরিয়ে গেল। হেলোটি পাঁচটা একশো টাকার নোট দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হবে?'

'হ্যাঁ। হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, যান।' হেলোটি তাকাল সৌমিত্রের দিকে।

হঠাৎ সৌমিত্র আবিষ্কার করল হেলোটির জন্যে তার মন খারাপ লাগছে। এই
হেলোটির সঙ্গে কদিন থেকে ওর সম্পর্কে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে হাত বাড়াল,
'ভাই, ভাল থেকে।'

হেলোটি হাসল, 'কী করে ভাল থাকব বলুন।'

'হঁ। তোমার নামটা এবার বলো।'

হেলোটি এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'ত্রিপুরা।' বলে ইশারা করল
অটোচালককে। অটো চলতে শুরু করল। তখনি হয়ে বসে থাকল সৌমিত্র। তার
মাথা কান্না করছিল না।

রাত্তা সর্বত্র ভাল নয়। প্রায়ই লাফাচ্ছে অটো। যতটা দূরেক যাওয়ার পর অটো
থামল। সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'গরম হয়ে গেছে। দশ মিনিটে ঠান্ডা হয়ে যাবে। আপনি চা খেতে পারেন।'

সৌমিত্র দেখল দুটো খাবারের সোকান রাত্তার পাশে। সে হাসল, 'আমার

পরসা নেই।'

'যা যাওয়ার খেয়ে নিন, দাম আমি দিচ্ছি।' অটোওয়াল বলল।

বিশে পেয়েছিল খুব। পেট ভরে পুরি ভরকারি আর চা খেল সৌমিত্র।
অটোওয়াল দাম দিচ্ছে দেখে সোকানদার অবাক। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কাছে
পরসা নেই?'

'না।' সৌমিত্র জবাব দিল।

'আপনি কোথেকে আসছেন?'

অটোওয়ালা হমক দিল, 'কেন? তোমার কী দরকার? বামের ধাবা খাবে
নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে সোকানদার হাত জোড়-করল, 'না না। ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

অটো চালু হলে সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'বাখের ধাবা জিনিসটা কী?'

অটোওয়াল হাসল, 'এই যাদের একজন আপনাকে আমার গাড়িতে তুলে দিয়ে
গেল তাদের বাখ বলে এরা। একবার ধাবা খেলে আর বাচতে হবে না।'

বাখ! অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্সকে এককথায় বাখ বলে এরা। সৌমিত্র চোখ
বন্ধ করল কিন্তু তার ঘুম আসছিল না। দু পাশে মাঠ, গাছগাছালি, অটো ছুটছিল।
সন্দের মুখে অটোওয়াল বলল, 'সামনে একটা জায়গা আছে। গ্যারেজে
ধাকতে পারবেন। রাতে আর যাব না।'

'এখান থেকে কত দূর আগরতলা?'

'মাইল কুড়ি।'

'যেতে অসুবিধে হবে?'

'হবে। গাড়িও গোলমাল করছে। সেখাতে হবে।'

'এখান থেকে বাসটাস পাওয়া যায় না?'

'রাতে এই লাইনে বাস যায় না। আপনাকে তো সকায়েই বলেছি।'

সৌমিত্র নেমে দাঁড়াল। বেশ কিছু সোকান রাত্তার দু পাশে। একটা গ্যারাজের
সামনে দাঁড়িয়েছিল অটোওয়াল। পকেটে একটাও পরসা নেই। আবার বিশে
পাচ্ছে। বারবার অটোওয়ালার কাছে চাওয়াও যাচ্ছে না। সে লক্ষ করল কেউ
কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে। একজনর কৌতূহল যেন বেশি। লোকটা এগিয়ে এল,
'কোথায় যাবেন?'

'আগরতলা।'

'অটোর এসেছেন?'

'হ্যাঁ। খারাপ হয়েছো।'

'এখন বাস পারেন না। মালবন্ডি থাকলে বলুন, ভাল থাকার ব্যবস্থা করে দিতে
পারি।'

জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল সৌমিত্র। একটা মাল বোঝাই ট্রাক আসছে।
হাত তুলে থামল সে ট্রাকটাকে। 'আগরতলায় যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

কথা না বলে উঠে পড়ল সে। ড্রাইভার ছাড়া আর একটা লোক ছিল। উঠে

বলল, 'আমি ভাঙার।'

জাইভার কী বুঝল সে-ই জানে। ট্রাক চলতে শুরু করল।

বাড়ির দরজায় অটো থেকে নামতেই নীলার চিংকার শোনা গেল। দোতলার জানলা থেকে দেখতে পেয়েছে। মুহূর্তে বাড়ির চেহারা বদলে গেল। সবাই এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। এমনকী পি বি-ও।

অটোগয়ানাকে ভাড়া দিয়ে ছেড়ে দেওয়ারমাত্র ফোন বাজল। বাসুদেবের গলা, 'কেনও খবর আছে?'

সৌমির ফোনটা ধরেছিল, 'হ্যাঁ। এইমাত্র ফিরেছি।'

'থ্যাক গড।' লাইনটা কেটে দিল বাসুদেব।

রাস্তার ধারে একটা এস টি ডি বুথ থেকে ফোন করেছিল বাসুদেব, আগরতলায় ঢোকান মুখে। বি এস একের জিপ ছেড়ে সে সোজা চলে এল বাড়িতে। গাড়ি বের করে ছুটল গাবারদির ফার্মে। তখন রাত নটা।

রাস্তা শুশন। চৌকিদার গোট খুলতেই বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ সাব।'

'বক্সিম কোথায়?'

'একটু আগে ওপরে গেল।'

'গাড়ি একেবারে কটোজের সামনে নিয়ে যেতেই বক্সিম বেরিয়ে এল, 'আপনি?'

'কী খবর?'

'আমি আর পারছি না। শুধু ছেড়ে দিতে বলে।'

'তুমি ঘরে গিয়ে শুর চোখ বাঁধো। হাত বাঁধা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'বঁধে বাইরে নিয়ে আসবে। আর আমার সঙ্গে মুখে না বলে ইশারায় কথা বলবে। জলদি করো।' বাসুদেব বলল।

বক্সিম ভৎস্কাণ্ড ছুটল। এই কাজ থেকে অব্যাহতি পাবে বুকে সে-ও খুশি হয়েছে। দশরথকে বের করে নিয়ে এল সে। বাসুদেব ইশারায় গাড়িতে ওঠাতে বলল। দশরথ জিজ্ঞাসা করল, 'কই যাও? রিপোর্টার আসে নাই? আমারে মাইয়া ফেলবা নাকি?'

বক্সিম বলল, 'চূপচাপ বসে থাকুন।'

ওই থাকল দশরথ। একটানা গাড়ি চালিয়ে গাবারদি থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটা বিশাল দিঘির কাছে চলে এল ওরা। ইশারায় দশরথকে নামাতে বলল বাসুদেব। চারদিকে ঘন অন্ধকার। দশরথ জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় আনলা আমারে?'

'বক্সিমকে দশরথের হাতসুটো খুলে দিতে ইশারা করল বাসুদেব। কিন্তু অন্ধকারে বক্সিম সেই ইশারা বুঝতে পারল না। তখন কাছে গিয়ে ওকে টেনে নিয়ে

এসে ফিসফিস করে বলল, 'খুলেই দৌড়ে গাড়িতে উঠে বসবে।'

বক্সিম তাই করল। ইঞ্জিন চালু রেখেছিল বাসুদেব। বক্সিম বসামাত্র গাড়ি ছোটল। এখন দশরথ তার চোখের বাঁধন খুলে নিয়ে যে করেই হোক একটা সাহায্য পেয়ে বাবেই। গাবারদির কথা সে কখনও জানতে পারবে না।

বাসুদেব গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল, 'ওকে কি বলেছি কোথায় আটকে রাখা হয়েছে?'

'না স্যার। অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছিল, বলিনি।'

'শুভ। ঠিকমতো খাওয়া হয়েছিল?'

'গেট ভরে খেত। আর কী নাক ডাকে!' বলেই বক্সিম জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু ডাক্তারদার কেনও খবর পাওয়া গেল?'

'তিনি বাড়িতে ফিরে গেছেন।'

'আঃ। বাঁচা গেল।' বক্সিম খুব খুশি।

গাড়ি ছুটছিল আগরতলার দিকে। হঠাৎ বক্সিম বলল, 'বাঃ খুব ভাল হয়ে গেছে।'

গাড়ি থামল বাসুদেব, 'কী হয়েছে?'

'আপনি যদি একবার গাবারদিতে যান তা হলে ভাল হয় স্যার।'

'কেন?'

'অবলা জীবগুলো বাজবলি হয়ে পড়ে আছে।'

'অবলা জীব? বাসুদেব অবাক।

'হ্যাঁ স্যার। আমি রোজ নতুন নতুন ধরে ওকে দেখাতাম। অতিটা টিকটিকি ধরেছিলাম আজ সকালে। ওভাবে পড়ে থাকলে কাল দুপুরের পর আর বাঁচবে না।' বক্সিম বলল।

হেসে ফেলল বাসুদেব, 'আজ আর পারছি না বক্সিম। ইচ্ছে হলে ওদের বাঁচাতে কাল সকালে তুমি গাবারদিতে যোয়ো।'

গাড়ি চালু করল বাসুদেব। আগরতলা আর বেশি দূরে নেই।

কিন্তু বাসুদেব বুঝতে পারছিল আগরতলায় পৌঁছে যাওয়া এখন যতটা সহজ ঠিক ততটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে এদেশের সমস্যাসাটা। এর সমাধান কে বলে দেবে?

১৩৫

Prince

৯১৬



সমরেশ মজুমদারের জন্ম ২৬ ফাল্গুন ১৩৪৮।

শৈশব কেটেছে ডুমুরের চা-বাগানে। জগদীশচন্দ্র জেলা কলেজের ছাত্র। কলকাতার আসেন ১৯৬০-এ। শিক্ষা: ব্রিটিশ চার্ট কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ।

লেখালেখি: প্রথমে গ্রন্থ বিচ্ছেদের করণে। তারপর নটক লিখতে গিয়ে গল্প লেখা। প্রথম গল্প 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৬৭ সালে। প্রথম উপন্যাস 'দৌড়'। ১৯৭৫-এ 'দেশ' পত্রিকায়।

গ্রন্থ: দৌড়, এই আমি বেণু, উত্তরাদিকার, বন্দীনিবাস, বড় গল্প যে, উলান গঙ্গা, বাসভূমি লক্ষ্মীর পাঁচালি, উনিশ বিশ, সওয়ার, কালবেলা, কালপুরুষ এবং আরও অনেক। সম্মান: ১৯৮২ সালের আনন্দ পুরস্কার তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি। এ ছাড়া 'দৌড়' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিসাবে বি এফ জে এ, নিশাদী এবং চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার। ১৯৮৪ সালে 'কালবেলা' উপন্যাসে পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।